১০
সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স
SEMICONDUCTOR AND ELECTRONICS

প্রধান শব্দ (Key Words) : ব্যান্ড তত্ত্ব, পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী, ইনট্রিনসিক ও এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর, স্বকীয় ও বহিঃজাত অর্ধপরিবাহী, পি-টাইপ এবং এন-টাইপ অর্ধ-পরিবাহী, ইলেকট্রন ও হোল, জাংশন ডায়োড, রেকটিফায়ার, ট্রানজিস্টর, অ্যাম্প্লিফায়ার, নম্বর পদ্ধতি, ডেসিমাল, বাইনারি, অক্টাল, হেক্সাডেসিমাল, বাইনারি অপারেশন, লজিক গেট, ট্রুথ টেবিল।

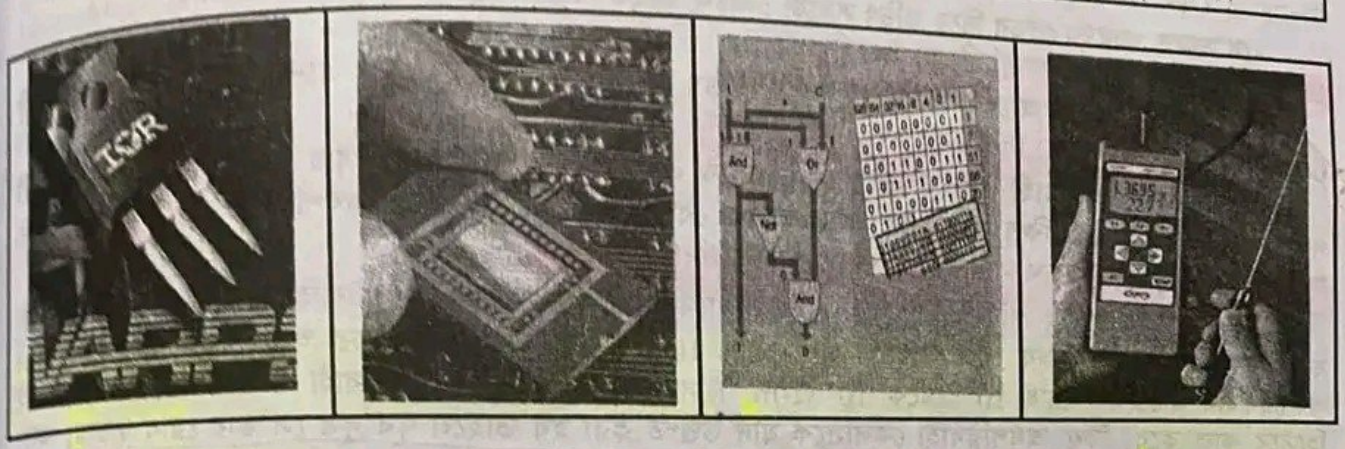

সূচনা
Introduction

ইলেকট্রনিক্স আধুনিক প্রয়োগ বিজ্ঞান (Applied Science)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এই শাখায় শূন্য মাধ্যম, গ্যাসীয় মাধ্যম বা সেমিকন্ডাক্টরের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রনের গতি এবং ওই গতির জন্য সৃষ্ট ঘটনার তত্ত্ব বিশদভাবে আলোচিত হয়। আধুনিক জীবনযাত্রায়, বিনোদনে, যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি অপরিহার্য। ইলেকট্রনিক্সের ব্যবহার আধুনিক জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। আমাদের অগ্রগতির পথকে ইলেকট্রনিক্স এমনভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যে সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া থেকে আরম্ভ করে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর সাহায্য নিতে হচ্ছে। এই অধ্যায়ে ইলেকট্রনিক্সের মূল বস্তু অর্ধপরিবাহী (semiconductor), ডায়োড, ট্রানজিস্টর, রেকটিফায়ার, অ্যাম্প্লিফায়ার, নম্বর পদ্ধতি, বাইনারি অপারেশন, লজিক গেট ও এদের ব্যবহার এবং আইসি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- কঠিন পদার্থের ব্যান্ড তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ব্যান্ড তত্ত্বের আলোকে পরিবাহী, অপরিবাহী এবং সেমিকন্ডাক্টর ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ইনট্রিন্সিক ও এক্সট্রিন্সিক সেমিকন্ডাক্টর ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সেমিকন্ডাক্টরে ইলেকট্রন ও হোলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর এবং এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর তৈরি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- জাংশন ডায়োডের গঠন ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- একমুখীকরণ (rectification) ব্যাখ্যা করতে পারবে।

  ব্যবহারিক : (১) পূর্ণতরঙ্গ একমুখীকরণ (দুটি ডায়োড ব্যবহার করে)
  (২) ডায়োডের সাহায্যে একমুখীকরণ (ব্রীজ রেকটিফায়ার ব্যবহার করে)
- জাংশন ট্রানজিস্টরের গঠন ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অ্যামপ্লিফায়ার ও সুইচ হিসেবে ট্রানজিস্টরের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রকার নম্বর পদ্ধতির মধ্যে রূপান্তর ব্যবহার করতে পারবে।
- বাইনারি অপারেশন ব্যবহার করতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রকার লজিক গেটের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করতে পারবে।

  ব্যবহারিক : (১) AND লজিক গেট-এর ট্রুথ টেবিল যাচাই
  (২) NOT লজিক গেট-এর ট্রুথ টেবিল যাচাই
  (৩) OR লজিক গেট-এর ট্রুথ টেবিল যাচাই

১০·১ অর্ধপরিবাহী
Semiconductor

ব্যান্ড তত্ত্ব আলোচনার পূর্বে পরিবাহী, অপরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহী পদার্থের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন।

১০·১·১ পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহীর ধারণা
Ideas about conductor, insulator and semiconductor

আমাদের আশে-পাশের সমস্ত পদার্থই কঠিন, তরল ও গ্যাস এই তিনটি অবস্থার যে কোনো একটি অবস্থায় বিদ্যমান। তড়িৎ পরিবাহিতার প্রকৃতি অনুসারে কঠিন পদার্থকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

যে সমস্ত পদার্থের ভেতর দিয়ে তড়িৎ সহজে চলাচল করতে পারে সেগুলোকে বলা হয় পরিবাহী (conductor)। যেমন সোনা, তামা, রূপা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি।

এক ধরনের পদার্থ আছে যার ভেতর দিয়ে তড়িৎ চলাচল করতে পারে না এদেরকে বলা হয় অপরিবাহী (insulator)। যেমন রাবার, সিরামিক, কাচ, কাঠ ইত্যাদি।

আমরা জানি, পরিবাহী এবং অন্তরকের মাঝামাঝি এক ধরনের পদার্থ আছে যার তড়িৎ পরিবাহিতা পরিবাহী পদার্থের চেয়ে অনেক কম; কিন্তু অন্তরকের চেয়ে অনেক বেশি। এগুলোকে বলা হয় অর্ধপরিবাহী। যেমন জার্মেনিয়াম, সিলিকন, কার্বন, ক্যাডমিয়াম সালফাইড, গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ইত্যাদি।

একটি পদার্থ কতটুকু পরিবাহী বা অন্তরক তা পদার্থের আপেক্ষিক রোধ বা পরিবাহিতার মান থেকে ধারণা করা যায়। যেমন তামার আপেক্ষিক রোধ সাধারণ তাপমাত্রায় $10^{-8}\ \Omega$-m; পক্ষান্তরে কাচের আপেক্ষিক রোধ $10^{16}\ \Omega$-m। অর্ধপরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ 10^{-5} থেকে $10^{8}\ \Omega$-m । সাধারণ তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহী পদার্থ অন্তরক বা অপরিবাহী হিসেবে কাজ করে; কিন্তু অর্ধপরিবাহী কেলাসকে যদি উত্তপ্ত করা হয় তাহলে খুব দ্রুত সে তার রোধ হারায়, অর্থাৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়। আবার তাপমাত্রা হ্রাস করলে অর্ধপরিবাহীর রোধ বৃদ্ধি পায়। পরম শূন্য তাপমাত্রায় পুরোপুরি কুপরিবাহীর ন্যায় আচরণ করে। সুপরিবাহী পদার্থের বেলায় এর উল্টো ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ উত্তপ্ত হলে সুপরিবাহী পদার্থের রোধ বৃদ্ধি পায়।

অর্ধপরিবাহী পদার্থের আর একটা বিশেষ ধর্ম হচ্ছে যে, যদি কোনো বিশুদ্ধ (pure) অর্ধপরিবাহীর সঙ্গে খুব নির্দিষ্ট অপদ্রব্যের খুব সামান্য অংশমাত্র (দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগমাত্র) মেশানো হয় তাহলে এর রোধ অনেক গুণ কমে যায়। এ ধরনের মিশ্রণ পদ্ধতিকে বলা হয় ডোপিং (doping)। বিভিন্ন ডিভাইস বা যন্ত্রাংশ তৈরিতে অপদ্রব্য মিশ্রিত অর্ধপরিবাহী পদার্থই ব্যবহার করা হয়।

সুপরিবাহী পদার্থের গঠন এমন যে, কোনো পরমাণুর অসম্পূর্ণ বাইরের কক্ষের (shell) যোজন (valence) ইলেকট্রনগুলো ঠিক পাশের পরমাণুর বাইরের কক্ষে চলে যায় তাদের অসম্পূর্ণ কক্ষকে পূর্ণ করার জন্য। এভাবে এক

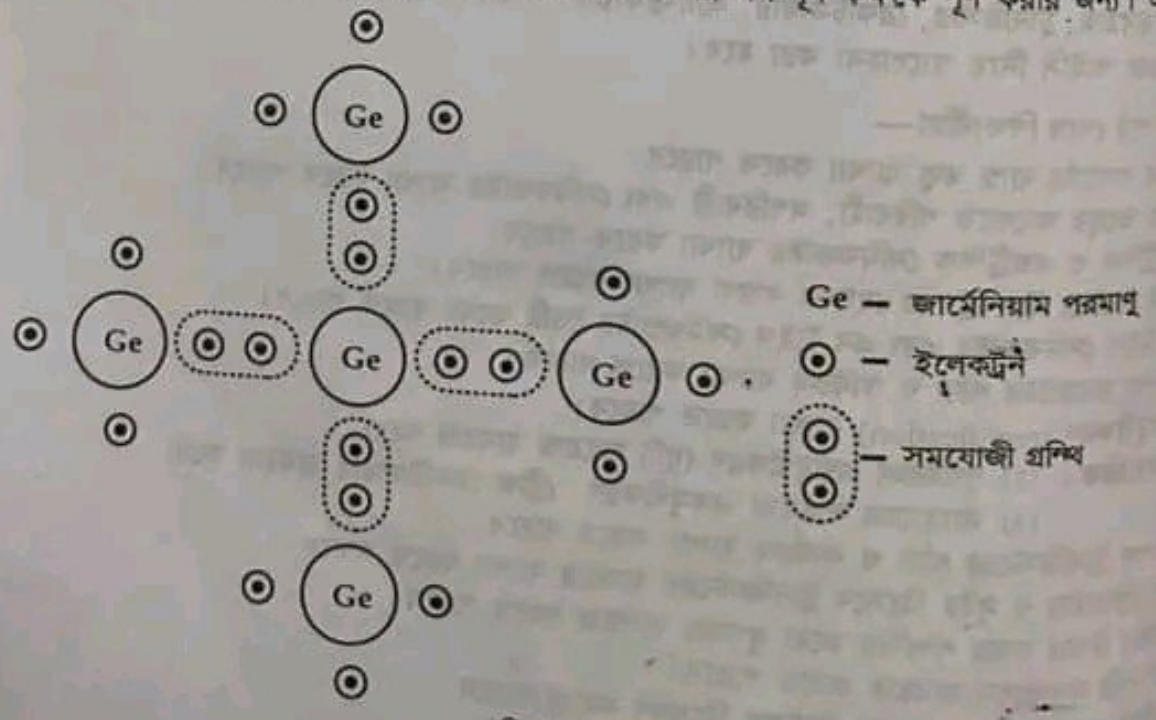

চিত্র ১০·১

পরমাণু থেকে অন্য পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলো স্বাধীনভাবে চলাফেরা

কিন্তু অপরিবাহী পদার্থের ওই রকম স্বাধীন বা মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না বলে তারা তড়িৎ পরিবহন করে না। ওই সমস্ত পদার্থের ইলেকট্রনগুলো পরমাণুতে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। অর্ধপরিবাহী পদার্থ জার্মেনিয়াম ও সিলিকন পরমাণুর বাইরের কক্ষে 4টি যোজন ইলেকট্রন থাকে। আমরা জানি যে, যে কোনো পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষে সর্বোচ্চ 8টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। 8টি ইলেকট্রন থাকলে পরমাণুটি সুস্থির অবস্থায় থাকে এবং পরমাণুটি অপরিবাহী হয়ে যায়। প্রত্যেক পরমাণুই সুস্থির অবস্থায় থাকতে চায় অর্থাৎ এরা বাইরের কক্ষে সর্বোচ্চ 8টি ইলেকট্রন পেতে চায়। জার্মেনিয়াম, সিলিকন ইত্যাদি এই ধরনের পরমাণু প্রয়োজনীয় বাকি ইলেকট্রনগুলো সংগ্রহ করে তাদের পাশের পরমাণু থেকে। লক্ষণীয় যে পাশের পরমাণু তার ইলেকট্রন একেবারেই দিয়ে দেয় না। এক্ষেত্রে পাশাপাশি দুটো পরমাণু নিজেদের মধ্যে একে অপরের ইলেকট্রন ব্যবহার বা ভাগাভাগি করে এক বিশেষ ধরনের গ্রন্থি বা বন্ড (bond) তৈরি করে। এ ধরনের গ্রন্থিকে বলা হয় **সমযোজী গ্রন্থি** (covalent bond)। চিত্র ১০·১-এ জার্মেনিয়াম ক্রেলাস যেভাবে সমযোজী গ্রন্থি তৈরি করে তা দেখানো হলো। সমযোজী গ্রন্থির মাধ্যমে প্রতিটি পরমাণু 8টি ইলেকট্রন প্রাপ্ত হয় এবং সুস্থির হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জার্মেনিয়াম বা সিলিকন সমযোজী গ্রন্থির সাহায্যে **বিশুদ্ধ ক্রেলাস** (intrinsic crystal) গঠন করে। বিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম বা সিলিকন ক্রেলাসে কোনো স্বাধীন বা মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না। ফলে পরম তাপমাত্রায় এদের তড়িৎ পরিবহন ক্ষমতা থাকে না। এই ধরনের বিশুদ্ধ ক্রেলাসের তাপমাত্রা বাড়ালে তাপীয় উত্তেজনায় ক্রেলাসের পরমাণুর কিছু কিছু গ্রন্থি ভেঙ্গে যায়; ফলে কিছু ইলেকট্রন মুক্ত হয় এবং তড়িৎ পরিবহন করে। এভাবে বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী পদার্থ স্বল্প তড়িৎ পরিবাহকত্ব লাভ করে।

১০·২ ব্যান্ড তত্ত্বের ধারণা
Concept of band theory

আমরা জানি, পরমাণুতে রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। পরমাণুর গঠন সম্পর্কীয় বোরের তত্ত্ব অনুযায়ী পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে প্রোটন এবং নিউট্রন। প্রোটনের চার্জ ধনাত্মক এবং নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই। ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রনগুলো কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে কেন্দ্রকে পরিবেষ্টন করে বিভিন্ন নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে।

১০·২·১ কঠিন পদার্থের শক্তি ব্যান্ড
Energy bands in solids

কঠিন পদার্থের শক্তি ব্যান্ড আলোচনায় উদাহরণ হিসেবে আমরা সোডিয়াম (Na) মৌল ও পরমাণু বিবেচনা করতে পারি। আমরা জানি, সোডিয়াম পরমাণুতে 11টি ইলেকট্রন রয়েছে এবং এই ইলেকট্রনগুলোর বিন্যাস হলো $1s^2$ $2s^2 2p^6 3s^1$। নিউক্লিয়াস দ্বারা আকর্ষণের ফলে একটি বিভব কূপের সৃষ্টি হয়। ইলেকট্রনগুলো এই বিভব কূপের মধ্যে বিভিন্ন শক্তিস্তরে পাউলির বর্জন নীতি অনুসরণ করে অবস্থান করে [চিত্র ১০·২(ক)]। পাউলির বর্জন নীতি অনুসারে প্রতিটি শক্তিস্তরে বিপরীত স্পিনসম্পন্ন দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে। সুতরাং সোডিয়াম পরমাণুর $1s$ স্তরে 2টি, $2s$ স্তরে 2টি ইলেকট্রন থাকে। $2p$ স্তরটি 3টি উপস্তরে বিভক্ত এবং এর প্রতিটি উপস্তরে 2টি করে ইলেকট্রন থাকে; অর্থাৎ $2p$ স্তরে মোট 6টি ইলেকট্রন থাকে এবং অবশিষ্ট ইলেকট্রনটি $3s$ স্তরে থাকে। সোডিয়াম পরমাণুর বাইরের এই স্তরটিতে অবস্থিত ইলেকট্রনকে যোজ্যতা ইলেকট্রন (Valence electron) বলা হয়। এখন কঠিন সোডিয়াম ক্রেলাসে বহু সংখ্যক পরমাণু থাকে। এই পরমাণুর ঘন সন্নিবেশের কারণে বিভব কূপের আকার পরিবর্তিত হয় যা চিত্র ১০.২(খ)-এ পূর্ণ রেখা দ্বারা দেখানো হয়েছে।

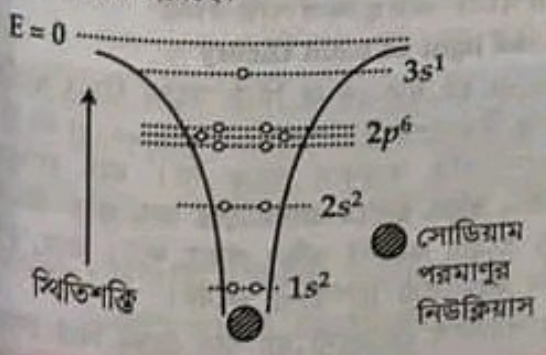

চিত্র ১০·২ (ক)

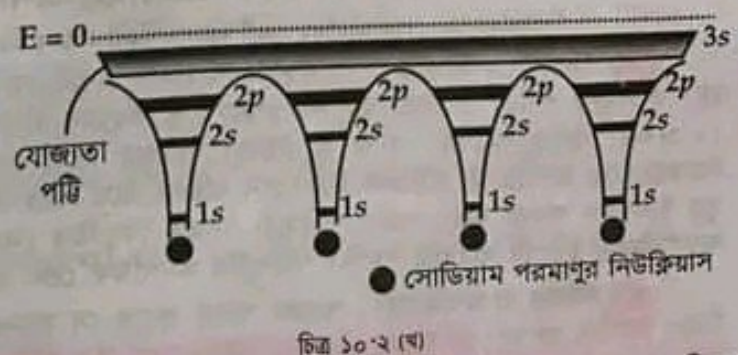

চিত্র ১০·২ (খ)

যোজ্যতা ইলেকট্রনগুলো ছাড়া অবশিষ্ট ইলেকট্রনগুলো (সোডিয়াম পরমাণুর ক্ষেত্রে 10টি) প্রতিটি পরমাণুর নিজস্ব বিভব কূপের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, ফলে এদের ওপর আশেপাশের পরমাণুগুলোর প্রভাব খুব সামান্যই হয়। কিন্তু

যোজ্যতা ইলেকট্রনগুলো বিভব কূপের মধ্যে আর আবদ্ধ থাকে না; প্রতিটি যোজ্যতা ইলেকট্রন অন্যান্য পরমাণুর দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং কোন ইলেকট্রনটি কোন পরমাণুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা আর নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না। সুতরাং সোডিয়াম কেলাসে 3s শক্তিস্তরে বহুসংখ্যক ইলেকট্রন অবস্থান করে। তবে যেহেতু পাউলির বর্জন নীতি অনুসারে একটি শক্তিস্তরে 2টির বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না, সুতরাং 3s শক্তিস্তরটি বহুসংখ্যক উপস্তরে বিভক্ত হয়ে যায় এবং প্রতিটি উপস্তরে সর্বাধিক 2টি বিপরীত স্পিনের ইলেকট্রন থাকে। এখন কেলাসের ভেতর খুব অল্প পরিসরে প্রায় 10^{20} সংখ্যক বা এর অধিক পরমাণু থাকে, ফলে ওই ধরনের উপস্তরের সংখ্যা এত বেশি হয় যে স্তরগুলির স্থিতিশক্তি প্রায় নিরবচ্ছিন্ন (continuous) ধরা যায়। সুতরাং উপস্তরগুলোর সমন্বয়ে 3s শক্তিস্তরে তৈরি হয় একটি শক্তি ব্যান্ড (energy band)। এই শক্তি ব্যান্ডকেই বলা হয় যোজ্যতা ব্যান্ড (valence band)।

শক্তি ব্যান্ড : কোনো পদার্থে বিভিন্ন পরমাণুতে কিন্তু একই কক্ষপথে আবর্তনরত ইলেকট্রনগুলোর শক্তির সামান্য তারতম্য হয়। একই কক্ষপথে অবস্থিত এই সকল ইলেকট্রনের শক্তির সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মানের মধ্যবর্তী পাল্লাকে শক্তি ব্যান্ড বলে।

যোজন ব্যান্ড : যে ইলেকট্রনগুলো পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথে অবস্থান করে তাদেরকে যোজন ইলেকট্রন বলে। কেলাসিত কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে যোজন ইলেকট্রনগুলির শক্তি যে বিস্তৃত পাল্লার মধ্যে থাকে তাকে যোজন পাল্লা বা যোজন ব্যান্ড বলে। সাধারণ পরমাণুতে দূরতম কক্ষপথে অবস্থিত ইলেকট্রনের শক্তি সর্বোচ্চ। এই ব্যান্ড পূর্ণ বা আংশিক পূর্ণ থাকতে পারে। কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ক্ষেত্রে যোজন ব্যান্ড পূর্ণ থাকে।

যদিও যোজ্যতা ইলেকট্রন প্রতিটি নিজ পরমাণুর প্রভাব থেকে বাইরে চলে আসে; কিন্তু এগুলো সম্পূর্ণ মুক্ত না। অন্যান্য পরমাণুসমষ্টির প্রভাবের মধ্যে থেকে যায়। ফলে তড়িৎ পরিবহনে অংশগ্রহণ করে না। তবে বাহিরে থেকে শক্তি অর্জন করে যোজ্যতা ইলেকট্রন অন্যান্য পরমাণুর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বাহিরে চলে যেতে পারে এবং সেটি পরিবহন ইলেকট্রনে পরিণত হয়। এই পরিবহন ইলেকট্রন তড়িৎ পরিবহনে অংশগ্রহণ করে। এখন অনেকগুলো যোজ্যতা ইলেকট্রন এক সঙ্গে শক্তি অর্জন করে পরিবহন ইলেকট্রনে পরিণত হতে পারে। এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলো একটি মাত্র স্তরে না থেকে একটি শক্তি ব্যান্ডে অবস্থান করে। এই শক্তি ব্যান্ডকেই বলা হয় পরিবহন ব্যান্ড (conduction band)। যোজ্যতা ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ডের মাঝখানের অঞ্চলে কোনো ইলেকট্রন থাকতে পারে না। এই অঞ্চলকে নিষিদ্ধ অঞ্চল (forbidden region) বলে এবং এই দুটি শক্তি ব্যান্ডের মধ্যবর্তী শক্তি ব্যবধানকে নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান (forbidden energy gap) বলা হয়।

পরিবহন ব্যান্ড : পরমাণুতে অবস্থিত মুক্ত যোজন ইলেকট্রন বিদ্যুৎ পরিবহনে অংশগ্রহণ করে ফলে এদেরকে পরিবহন ইলেকট্রন বলে। এই ইলেকট্রনগুলোর শক্তির পাল্লা বা ব্যান্ডকে পরিবহন ব্যান্ড বলে।

পরিবহন ব্যান্ডের সকল ইলেকট্রনই মুক্ত ইলেকট্রন। যদি কোনো বস্তুতে পরিবহন ব্যান্ড ফাঁকা থাকে তাহলে সেই বস্তুতে তড়িৎ পরিবহন করা সম্ভব হয় না। অন্তরকে পরিবহন ব্যান্ড সম্পূর্ণ ফাঁকা থাকে আর যোজন ব্যান্ড আংশিক পূর্ণ থাকে। ধাতব পদার্থে যোজন ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের সাথে শিথিলভাবে যুক্ত থাকে। সাধারণ তাপমাত্রায় এই সকল ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারে। এই মুক্ত ইলেকট্রনই পরিবহন বিদ্যুৎ পরিবহন করে।

নিষিদ্ধ শক্তি ব্যান্ড : যোজন ব্যান্ড এবং পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যবর্তী শক্তির পাল্লাই হলো নিষিদ্ধ শক্তি ব্যান্ড। এই নিষিদ্ধ শক্তি অঞ্চলে কোনো অনুমোদিত শক্তি স্তর না থাকায় এই অঞ্চলে কোনো ইলেকট্রন থাকতে পারে না। কেলাসের মধ্যে কোনো ইলেকট্রনকে যোজন ব্যান্ড থেকে পরিবহন ব্যান্ডে তুলতে হলে ইলেকট্রনকে সর্বনিম্ন যে শক্তি সরবরাহ করতে হয় তা নিষিদ্ধ শক্তি ব্যান্ডের শক্তির সমান।

১০·২·২ ব্যান্ড তত্ত্বের আলোকে পরিবাহী, অপরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহী
Conductor, insulator and semiconductor in the light of band theory

(ক) পরিবাহী : পরিবাহী পদার্থ বলতে সে সমস্ত পদার্থ বোঝানো হয় যার ভেতর দিয়ে সহজে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এ সমস্ত পদার্থে যোজ্যতা ব্যান্ডের ওপরাংশ ও পরিবহন ব্যান্ডের নিম্নাংশের উপরিপাত (overlapping) হয় [চিত্র ১০.৩(ক)]। অর্থাৎ পরিবহন ব্যান্ড ও যোজন ব্যান্ডের মধ্যে কোনো শক্তি ব্যবধান থাকে না। ফলে যোজন ইলেকট্রনগুলো অনায়াসেই পরিবহন ইলেকট্রনে পরিণত হতে পারে অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহে অংশগ্রহণের জন্য প্রচুর পরিমাণ মুক্ত ইলেকট্রন পাওয়া যায়। এজন্য পরিবাহী পদার্থে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলেই তড়িৎ প্রবাহ ঘটে। তামা, রুপা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি পরিবাহী পদার্থ। পরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ কম হয়—প্রায় $10^{-8}\ \Omega$-m ক্রমের।

(খ) অন্তরক বা অপরিবাহী : অন্তরক পদার্থ বলতে সে সমস্ত পদার্থকে বোঝানো হয় যার ভেতর দিয়ে কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না। যে সমস্ত পদার্থের যোজন ব্যান্ড ইলেকট্রন দ্বারা আংশিক পূর্ণ থাকে এবং পরিবহন ব্যান্ড সম্পূর্ণ খালি থাকে; এছাড়া যোজন ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যে শক্তির ব্যবধান খুব বেশি হয়, সেগুলোকে অন্তরক বলে। অন্তরকে শক্তি ব্যবধান 6 eV থেকে 15 eV-এর মতো হয় [চিত্র ১০.৩(খ)]। তাপমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেলে কিছু ইলেকট্রন

যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে পরিবহন ব্যান্ডে যেতে পারে এবং তড়িৎ প্রবাহে অংশগ্রহণ করে। তবে এ ধরনের ইলেকট্রনের সংখ্যা খুবই নগণ্য। কাচ, প্লাস্টিক, কাঠ ইত্যাদি অন্তরক পদার্থ। অপরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ অনেক বেশি—প্রায় 10^{12} Ω-m ক্রমের।

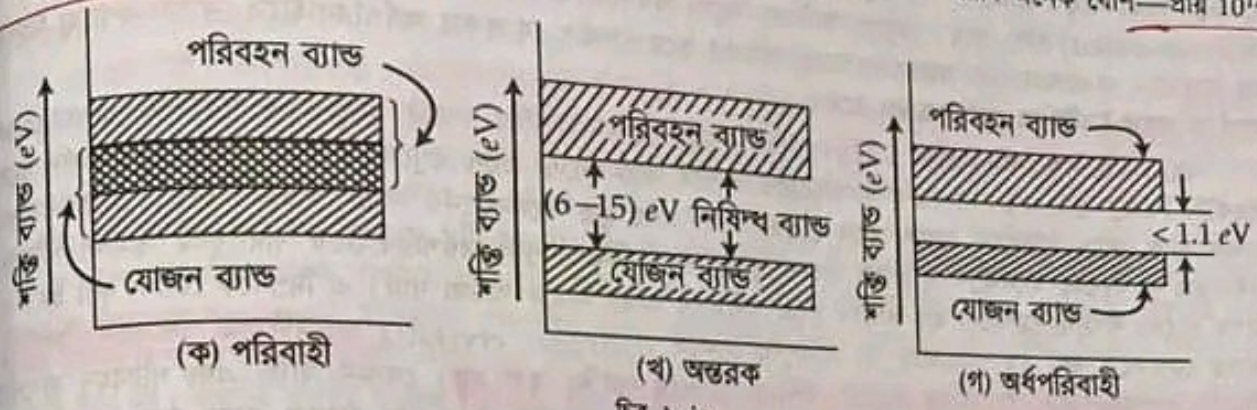

(ক) পরিবাহী (খ) অন্তরক (গ) অর্ধপরিবাহী

চিত্র ১০.৩

(গ) অর্ধপরিবাহী : অর্ধপরিবাহী বস্তুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা অন্তরক ও পরিবাহীর মাঝামাঝি। এদের আপেক্ষিক রোধ 10^{-4} Ω-m ক্রমের। জার্মেনিয়াম, সিলিকন ইত্যাদি অর্ধপরিবাহী পদার্থ। শক্তি ব্যান্ডের আলোকে বলা যায় যে এ সমস্ত পদার্থের যোজন ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যে শক্তির পার্থক্য অন্তরকের চেয়ে অনেক কম থাকে [চিত্র ১০.৩ (গ)]। সাধারণত পার্থক্য 1 eV মানের বা তার কিছু কম-বেশি হয়। জার্মেনিয়াম ও সিলিকন মৌলের ক্ষেত্রে এই মান যথাক্রমে 0.7 eV এবং 1.1 eV। এই কারণে ওই দুটি পদার্থ উত্তম অর্ধপরিবাহী। কক্ষ তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহীর (i) আংশিক পূর্ণ পরিবহণ ব্যান্ড ও (ii) আংশিক পূর্ণ যোজন ব্যান্ড থাকে। পরম তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহীর পরিবহণ ব্যান্ড সম্পূর্ণ খালি এবং যোজন ব্যান্ড সম্পূর্ণ পূর্ণ থাকে। ফলে অর্ধপরিবাহীতে অল্প পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করলেই ইলেকট্রনগুলো যোজন ব্যান্ড থেকে পরিবহন ব্যান্ডে স্থানান্তরিত হয়। পরম তাপমাত্রায় সিলিকন বা জার্মেনিয়াম আদর্শ অন্তরক। ফলে কোনো ইলেকট্রন পরিবহন ব্যান্ডে এসে মুক্ত ইলেকট্রনে পরিণত হতে পারে না। মুক্ত ইলেকট্রন না থাকার কারণে অর্ধপরিবাহক এই তাপমাত্রায় পুরোপুরি অপরিবাহী পদার্থের ন্যায় আচরণ করে। অর্ধপরিবাহীতে তাপমাত্রা

(ক) পরম তাপমাত্রায় (খ) কক্ষ তাপমাত্রায়

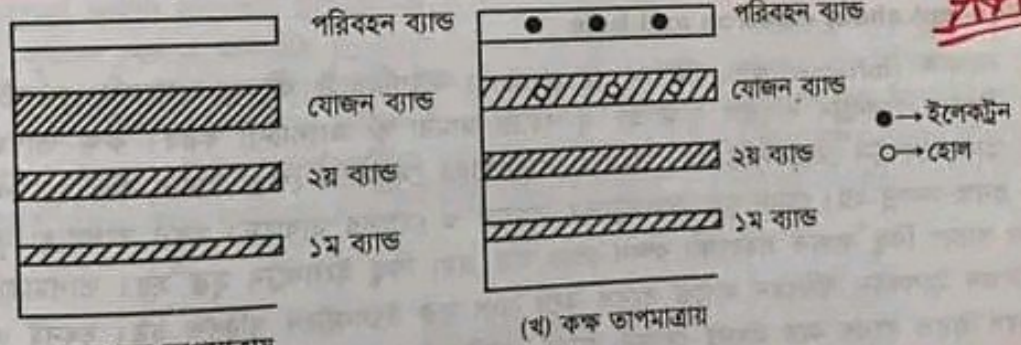

চিত্র ১০.৪

প্রয়োগ করলে কিছু সংখ্যক সমযোজী অনুবন্ধক ভেঙে গিয়ে কিছু সংখ্যক যোজন ইলেকট্রন পরিবহন ব্যান্ডে যাওয়ার শক্তি অর্জন করে এবং মুক্ত ইলেকট্রনে পরিণত হয়। একটি যোজন ইলেকট্রন যখনই পরিবহন ব্যান্ডে প্রবেশ করে তখনই যোজন ব্যান্ডে ওই অবস্থানে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়, একে হোল বলে। এর কার্যকর আধান $+e$। এটি কোনো বাস্তব কণা নয়। চিত্র ১০.৪-এ সিলিকন কেলাসের পরম তাপমাত্রা ও কক্ষ তাপমাত্রার শক্তি ব্যান্ড অবস্থা দেখানো হয়েছে।

জানা দরকার :
১। সাধারণ তাপমাত্রায় উত্তম পরিবাহীতে মুক্ত ইলেকট্রন ঘনত্ব, $n = 10^{28} m^{-3}$ (প্রায়)
২। সাধারণ তাপমাত্রায় অন্তরক পদার্থে মুক্ত ইলেকট্রন ঘনত্ব, $n = 10^{7} m^{-3}$ (প্রায়)
৩। সাধারণ তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহী পদার্থে মুক্ত ইলেকট্রন ঘনত্ব, $n = 10^{16} m^{-3}$ (প্রায়)

১০.৩ ইনট্রিনসিক (স্বকীয় বা বিশুদ্ধ) ও এক্সট্রিনসিক (বহিঃজাত বা অবিশুদ্ধ) সেমিকন্ডাক্টর
Intrinsic and extrinsic semiconductors

অর্ধপরিবাহী পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (ক) ইনট্রিন্সিক (Intrinsic) সেমিকন্ডাক্টর বা স্বকীয় বা বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী (খ) এক্সট্রিন্সিক (Extrinsic) সেমিকন্ডাক্টর বা বহিঃজাত বা অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী।

(ক) ইনট্রিন্সিক সেমিকন্ডাক্টর : পূর্বেই বলা হয়েছে যে জার্মেনিয়াম বা সিলিকনের বাইরের কক্ষে 4টি যোজন ইলেকট্রন থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেশী পরমাণুর সঙ্গে ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে সমযোজী বন্ধনের সাহায্যে বিশুদ্ধ কেলাস (Intrinsic crystal) গঠন করে। এগুলোকে বলে বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী। নিম্ন তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে কোনো মুক্ত ইলেকট্রন না থাকায় এরা অন্তরকের ন্যায় আচরণ করে। অর্থাৎ **যে সকল অর্ধপরিবাহীতে কোনো অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে না তাকে ইনট্রিন্সিক সেমিকন্ডাক্টর বলে।**

(খ) এক্সট্রিন্সিক সেমিকন্ডাক্টর : বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে কিছু কিছু সমযোজী বন্ধন থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাধারণ তাপমাত্রায়ও তাপীয় আলোড়নের ফলে এগুলো যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি অর্জন করে যোজন ব্যান্ড থেকে পরিবহন ব্যান্ডে চলে যেতে পারে এবং মুক্ত ইলেকট্রনের ন্যায় আচরণ করে। তবে সাধারণ তাপমাত্রায় এ ধরনের ইলেকট্রন বাহকের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে যদি খুবই সামান্য পরিমাণ বিশেষ ধরনের অপদ্রব্য মেশানো হয় তাহলে প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ বাহক পাওয়া যায়। এ মিশ্রণকে ডোপিং বলা হয়। এ ধরনের কেলাসকে বলা হয় বহিঃজাত বা অবিশুদ্ধ কেলাস (Extrinsic crystal)। জার্মেনিয়াম, সিলিকন কেলাসে এন্টিমনি, অ্যালুমিনিয়াম, আর্সেনিক ইত্যাদি অপদ্রব্য মিশিয়ে ডোপিং করা হয়। যোজন ব্যান্ড এবং পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যে শক্তি ব্যবধান অনেক কমে আসে। ফলে কেলাসে আধান বাহকের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এ ধরনের কেলাসের পরিবাহিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ **যে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে সামান্য পরিমাণ অপদ্রব্য মিশ্রিত করে অর্ধপরিবাহীর তড়িৎ পরিবাহিতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়, তাকে ডোপিং বলে।** মিশ্রিত অপদ্রব্যকে বলা হয় ডোপ্যান্ট (Dopant)। ত্রিযোজী মৌল যেমন অ্যালুমিনিয়াম (Al), বোরন (B), ইন্ডিয়াম (In) অথবা পঞ্চযোজী মৌল যেমন ফসফরাস (P), আর্সেনিক (As), বিসমাথ (Bi)-কে বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে ডোপিং করে এক্সট্রিন্সিক সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করা হয়।

কাজ: একটি অবিশুদ্ধ (extrinsic) অর্ধপরিবাহীর তড়িৎ পরিবাহিতা কীসের ওপর নির্ভর করে ?

একটি অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে অসম সংখ্যক ইলেকট্রন ও হোলের ওপর তড়িৎ পরিবাহিতা নির্ভর করে।

১০·৪ ইলেকট্রন ও হোলের ধারণা
Concept about electron and hole

আমরা সহজাত (Intrinsic) এবং বহির্জাত (Extrinsic) অর্ধপরিবাহী কী তা জেনেছি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে। অর্ধপরিবাহীতে কীভাবে ইলেকট্রন ও হোল সৃষ্টি হয় এ পর্যায়ে আমরা তা আলোচনা করব। কক্ষ তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে হোল ইলেকট্রন জোড় সৃষ্টি হয়। যখন অর্ধপরিবাহীতে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয় তখন এর মধ্যে দুভাবে কারেন্ট প্রবাহ সম্পন্ন হয়। যেমন মুক্ত ইলেকট্রনের মাধ্যমে ও হোলের মাধ্যমে। যখন তাপমাত্রা বৃদ্ধি করা হয় তখন তাপশক্তির কারণে কিছু সংখ্যক সমযোজী বন্ধন ভেঙে যায় এবং কিছু ইলেকট্রন মুক্ত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে কিছু সংখ্যক যোজন ইলেকট্রন পরিবহন ব্যান্ডে প্রবেশ করে এবং মুক্ত ইলেকট্রনে পরিণত হয়। যখনই একটি যোজন ইলেকট্রন পরিবহন ব্যান্ডে প্রবেশ করে তখনই যোজন ব্যান্ডে একটি শূন্যস্থান বা হোলের সৃষ্টি হয়। বিভব পার্থক্য বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রভাবে অর্ধপরিবাহীতে ইলেকট্রন ও হোল উভয়ের প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

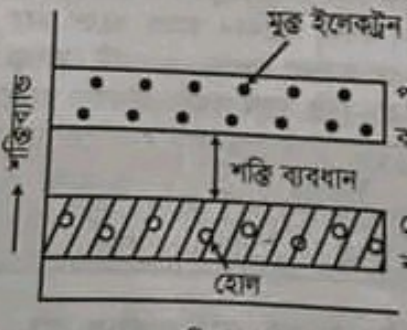

চিত্র ১০·৫

আমাদের সবচেয়ে পরিচিত বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী হলো জার্মেনিয়াম (Ge) ও সিলিকন (Si)। এদের যোজন ও পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যবর্তী শক্তি ব্যবধান 0·72 eV এবং 1·1 eV। কক্ষ তাপমাত্রায় কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন এই ক্ষুদ্র শক্তি ব্যবধান অতিক্রম করে যোজন ব্যান্ড থেকে পরিবহন ব্যান্ডে গমন করে। ফলে যোজন ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ডে সমসংখ্যক হোল ও ইলেকট্রনের উদ্ভব ঘটে [চিত্র ১০·৫]। এই ঘটনাকে হোল-ইলেকট্রন জোড় সৃষ্টি বলে।

অন্যভাবে বলা যায় পরিবহন ব্যান্ডে ইলেকট্রনের গমনের কারণে যোজন ব্যান্ডে সৃষ্টি হয় পজেটিভ চার্জযুক্ত হোল। পরম শূন্য তাপমাত্রার উপরে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হলে পরিবহন ইলেকট্রন অ্যানোডের দিকে এবং হোলগুলো ক্যাথোডের দিকে ধাবিত হয়। তাই বলা যায় অর্ধপরিবাহী প্রবাহ হলো পরিবহন ও যোজন ব্যান্ডের মধ্যে যথাক্রমে ইলেকট্রন ও হোলের পরস্পরের বিপরীত দিকে চালিত হওয়া।

এন-টাইপ ও পি-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী
n-type and p-type semiconductors

অবিশুদ্ধ কেলাস বা অর্ধপরিবাহী পদার্থ আবার দুই রকমের, যথা n-টাইপ ও p-টাইপ। Negative শব্দের আদ্যাক্ষর 'n' থেকে n-type এবং Positive এর 'p' থেকে p-type অর্ধপরিবাহীর নামকরণ করা হয়েছে।

(i) এন-টাইপ অর্ধপরিবাহী : জার্মেনিয়াম বা সিলিকন অর্ধপরিবাহীর সঙ্গে পঞ্চযোজী মৌল মিশিয়ে n-টাইপ অর্ধপরিবাহী তৈরি করা হয়। পঞ্চযোজী এন্টিমনি বা আর্সেনিক বিশেষ প্রক্রিয়ায় উচ্চতাপে মেশানো হয়। মেশানোর সময় অপদ্রব্যের পরিমাণ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যেন এর পরমাণুগুলো জার্মেনিয়াম বা সিলিকন কেলাসের মূল কাঠামোর (structure) কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে কেলাস জাফরির (crystal lattice) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এন্টিমনি বা আর্সেনিকের 5টি যোজন ইলেকট্রনের 4টি জার্মেনিয়াম বা সিলিকনের 4টি যোজন (valence) ইলেকট্রনের অংশীদার হয়ে বা পাশাপাশি অবস্থানের মাধ্যমে সমযোজী বন্ধন তৈরি করে। প্রতিটি আর্সেনিক বা এন্টিমনি পরমাণুর একটি ইলেকট্রন উদ্বৃত্ত থাকে এবং ওই ইলেকট্রন কেলাসের মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে [চিত্র ১০·৬]। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রতিটি অপদ্রব্য পরমাণু একটি করে মুক্ত ইলেকট্রন দান করে। তাই অপদ্রব্য পরমাণুকে এক্ষেত্রে দাতা (donor) পরমাণু বলা হয়। এছাড়া তাপীয় উত্তেজনার জন্য কিছু বন্ধন ভেঙ্গে সমসংখ্যক ইলেকট্রন ও হোল তৈরি হয়। সুতরাং n-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে ইলেকট্রন ও হোল উভয়েরই উপস্থিতি থাকে। কিন্তু ইলেকট্রনের সংখ্যা হোলের তুলনায় বহুগুণ বেশি থাকে। এভাবে গঠিত কেলাসে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে প্রায় 10^{17} সংখ্যক স্বাধীন ইলেকট্রন থাকে। তড়িৎ পরিবহন ঋণাত্মক ইলেকট্রনই মুখ্য ভূমিকা পালন করে বলে এগুলোকে 'সংখ্যাগুরু বা গরিষ্ঠ বাহক' (majority carrier) বলে। ধনাত্মক হোল তড়িৎ পরিবহনে গৌণ ভূমিকা পালন করে এবং এগুলোকে 'সংখ্যালঘু বা লঘিষ্ঠ বাহক' (minority carrier) বলা হয়।

(ii) পি-টাইপ অর্ধপরিবাহী : বিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম বা সিলিকনের সঙ্গে 3 যোজী মৌল যেমন গ্যালিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি অপদ্রব্য সামান্য পরিমাণে নিয়ন্ত্রিতভাবে মেশানো হলে p-টাইপ কেলাস তৈরি করা যায়। অ্যালুমিনিয়ামের যেহেতু তিনটি যোজনী ইলেকট্রন রয়েছে, এই পরমাণু তার চারপাশের জার্মেনিয়াম বা সিলিকন পরমাণুর তিনটি যোজন (valence) ইলেকট্রনের সঙ্গে সমযোজী বন্ধন তৈরি করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জার্মেনিয়াম বা সিলিকন পরমাণুর চতুর্থ ইলেকট্রন কোনো সমযোজী বন্ধন তৈরি করে না। কারণ অ্যালুমিনিয়ামের একটি ইলেকট্রনের ঘাটতি রয়েছে। ইলেকট্রনের এ ঘাটতির জন্য অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুতে একটি হোলের সৃষ্টি হবে [চিত্র ১০·৭]। সুতরাং কেলাস জাফরির (crystal lattice) মধ্যে প্রত্যেক অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুতে একটি করে হোলের সৃষ্টি হবে এবং এভাবে সৃষ্ট হোলগুলো ইলেকট্রন গ্রহণে উদগ্রীব থাকবে। এজন্য অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুকে 'গ্রহীতা' (Acceptor) পরমাণু বলা হয়। ধনাত্মক তড়িৎধর্মী হোলের সংখ্যা তাপীয় উত্তেজনায় সৃষ্ট ইলেকট্রনের তুলনায় অনেক গুণ বেশি থাকে। সুতরাং p-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে ধনাত্মক তড়িতাধানই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ হোলই এক্ষেত্রে 'সংখ্যাগুরু বাহক' (majority carrier) এবং ইলেকট্রন 'সংখ্যালঘু বাহক' (minority carrier)।

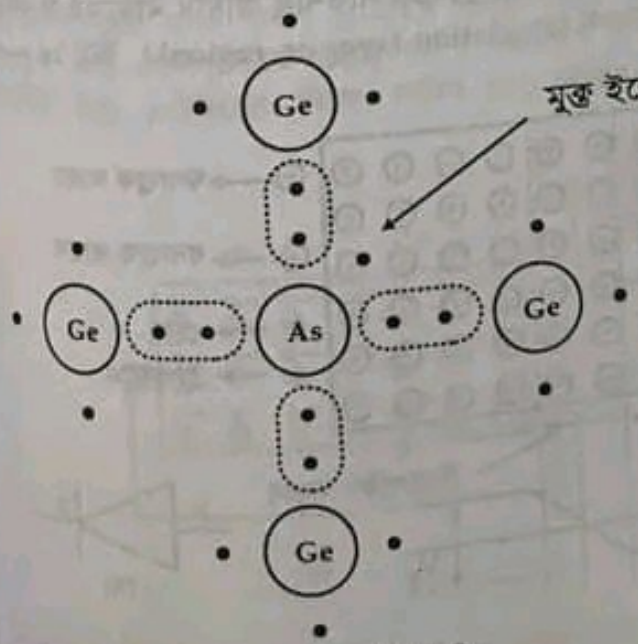

চিত্র ১০·৬ : n-টাইপ অর্ধপরিবাহী।

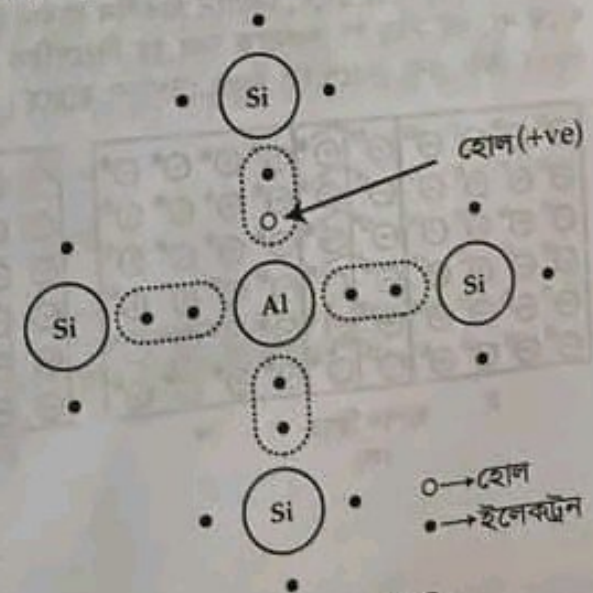

চিত্র ১০·৭ : p-টাইপ অর্ধপরিবাহী।

ওপরের n-টাইপ ও p-টাইপ অর্ধপরিবাহীর আলোচনা থেকে জানা যায় যে বিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম বা সিলিকন অর্ধপরিবাহী কোন ধরনের কেলাসে পরিণত হবে তা নির্ভর করবে অপদ্রব্যের যোজন ইলেকট্রন সংখ্যার ওপর। বিশুদ্ধ

অর্ধপরিবাহীর যোজন ইলেকট্রনের চেয়ে অপদ্রব্যের যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা বেশি হলে n-টাইপ কেলাস এবং কম হলে p-টাইপ কেলাস তৈরি হবে। তবে n-টাইপ বা p-টাইপ কেলাসের কোনোটাই কিন্তু তড়িতাহিত হয় না। কারণ n-টাইপ কেলাসের অতিরিক্ত ইলেকট্রনের ঋণাত্মক আধান আর্সেনিক পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক আধান দ্বারা প্রশমিত হয়। আবার p-টাইপের সৃষ্ট হোলের ধনাত্মক আধান জার্মেনিয়াম, সিলিকন পরমাণুর ঋণাত্মক আধানের দ্বারা নিষ্ক্রিয় হয়। অর্থাৎ, n- এবং p-টাইপ পদার্থ বস্তুতপক্ষে তড়িৎ নিরপেক্ষ।

কাজ : সমান রোধের দুটি দণ্ড তোমাকে দেওয়া হলো। এর একটি অর্ধপরিবাহী এবং অপরটি পরিবাহী। পরীক্ষা দ্বারা কীভাবে তুমি চিহ্নিত করতে পারবে ?

আমরা জানি, তাপমাত্রা বাড়ালে পরিবাহীর রোধ বাড়ে এবং অর্ধপরিবাহীর রোধ কমে। সুতরাং, তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে দণ্ড দুটিকে পরপর একই তড়িৎ উৎসের সঙ্গে যুক্ত করলে যেটির মধ্য দিয়ে প্রবাহমাত্রা বৃদ্ধি হবে সেটি অর্ধপরিবাহী দণ্ড এবং অন্যটি পরিবাহী দণ্ড হিসেবে চিহ্নিত হবে।

১০·৬ জাংশন ডায়োড : গঠন ও কার্যক্রম
Junction diode : construction and working principle

১০·৬·১ গঠন
Construction

একটি p-টাইপ ও একটি n-টাইপ অর্ধপরিবাহীকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে সংযুক্ত করলে সংযোগ পৃষ্ঠকে p-n জাংশন বলে। একটি বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী কেলাসের এক অর্ধাংশ p-টাইপ অর্ধপরিবাহী এবং অপর অর্ধাংশকে n-টাইপ অর্ধপরিবাহী উচ্চতাপে সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে মিশিয়ে p-n জাংশন তৈরি করা হয়।

p-n জাংশনের যে পাশে p-টাইপ অঞ্চল সেখানে সংখ্যাগুরু বাহক হোল এবং যে পাশে n-টাইপ অঞ্চল সেখানে ইলেকট্রনের আধিক্য অনেক বেশি। যখন n-টাইপ অঞ্চল এবং p-টাইপ অঞ্চল যুক্ত হয় তখন n-এর ইলেকট্রনগুলো p-এর হোল দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে জাংশনের দিকে ছুটে যায়। একইভাবে p-অঞ্চলের হোলগুলো n-এর ইলেকট্রন দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ব্যাপনের মাধ্যমে সংযোগস্থলের দিকে ছুটে যায় [চিত্র ১০·৮(ক)]। p-n জাংশনস্থলে ইলেকট্রন ও হোল পরমাণু মিলিত হয়ে নিরপেক্ষ হয়ে যায়। n-টাইপের যে পরমাণু থেকে ইলেকট্রন জাংশনের দিকে ছুটে যায় সেটি ধনাত্মক আয়নে এবং p-অঞ্চলের যে পরমাণু থেকে হোল ছুটে আসে সেটি ঋণাত্মক আয়নে রূপান্তরিত হয় [চিত্র ১০·৮ (খ)]। p-n জাংশন ডায়োডের সাংকেতিক চিত্র ১০·৮(গ)-এ দেখানো হলো।

এখন p-অঞ্চল থেকে ছুটে আসা হোল ধনাত্মক আয়ন এবং n-অঞ্চল থেকে আসা ইলেকট্রন ঋণাত্মক আয়ন দ্বারা বিকর্ষিত হয়। এভাবে সংযোগস্থলে একটি পাতলা পর্দার মতো নিঃশেষিত অঞ্চল বা স্তর সৃষ্টি হয়। এ অঞ্চল বা স্তরের বেধ সাধারণত 10^{-6} m থেকে 10^{-5} m হয়। p-n সংযোগের দুই পাশে যে সরু স্তর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানকে পৃথক করে রাখে, যেখানে গতিশীল আধান নিঃশেষ হয়ে যায় এবং কোনো গতিশীল আধান বাহকের অস্তিত্ব থাকে না, ওই স্তর বা অঞ্চলকে বলা হয় নিঃশেষিত স্তর বা অঞ্চল (Depletion layer or region)। চিত্র ১০·৮-এ ব্যাপন ক্রিয়া এবং নিঃশেষিত অঞ্চল দেখানো হয়েছে।

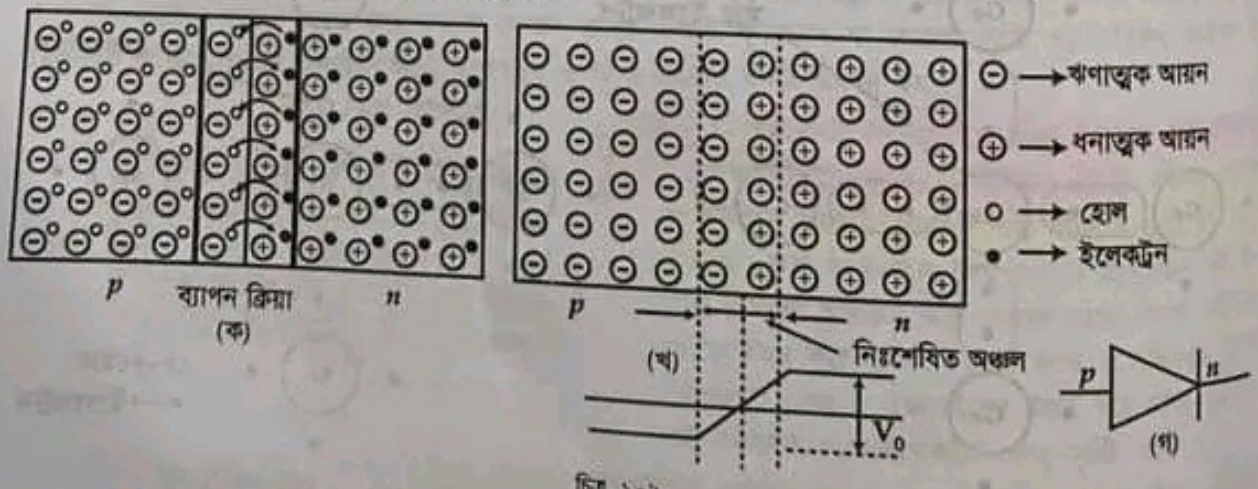

চিত্র ১০·৮

এই নিঃশেষিত অঞ্চলকে জাংশন প্রাচীর (Junction barrier) বলা হয়। এই জাংশনে সামান্য পরিমাণ অভ্যন্তরীণ বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হয়। ফলে এই অঞ্চলকে অনেক সময় বিভব পার্থক্য অঞ্চল বা বিভব পার্থক্য প্রাচীর বলে। এর মান সাধারণত 0·1 থেকে 0·3 V। চিত্র ১০·৮(খ) থেকে এটা পরিষ্কার যে বিভব পার্থক্য প্রাচীর V_0 বিদ্যুৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি

করে যা সংখ্যাগুরু বাহককে নিজ নিজ অঞ্চল থেকে প্রাচীর অতিক্রমে বাধা প্রদান করে। এভাবে সংযুক্ত হয়ে 'জাংশন ডায়োড' (সংক্ষেপে 'ডায়োড') তৈরি করে। p-n অর্ধপরিবাহী কেলাস অনেক ইলেকট্রনিক ডিভাইস তৈরিতে ডায়োড বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

জাংশনের ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ কোনো একদিকে খুব সহজেই যেতে পারে। কিন্তু উচ্চতর বহিঃভোল্টেজ প্রয়োগ ছাড়া বিপরীত দিকে যেতে পারে না। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আমরা জানব।

জেনে রাখ : ডায়োড কি কেবল রেকটিফায়ার বর্তনীতে বা AC কে DC করার কাজে ব্যবহৃত হয় না অন্য কোথাও ব্যবহার করা হয় ?

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে টিভি, টেলিফোন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি স্বাভাবিক ব্যবহারিক উপাদানে ডায়োড ব্যবহৃত হয়। এছাড়া AC কে DC করাসহ বেতার ও টিভির মধ্যে সিগন্যাল ডিটেক্টর হিসেবে ডায়োড ব্যবহৃত হয়।

কাজ : ডোপিং করলে অর্ধপরিবাহীর পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায় কেন ?

বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে সুবিধাজনক অপদ্রব্য অতি সামান্য পরিমাণে নিয়ন্ত্রিতভাবে মেশানোর প্রক্রিয়াকে ডোপিং বলে। ডোপিং এর ফলে অর্ধপরিবাহীর পরিবহন ধর্ম বেড়ে যায়। কারণ অর্ধপরিবাহী কেলাসে তখন মুক্ত ইলেকট্রন সংখ্যা বা হোল সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়।

১০.৬.২ কার্যক্রম
Working process

বাইরে থেকে p-n-জাংশন বরাবর দুভাবে বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। যথা—সম্মুখবর্তী ঝোঁক বা ফরোয়ার্ড বায়াস ও বিপরীত ঝোঁক বা রিভার্স বায়াস প্রয়োগ।

ক. সম্মুখবর্তী ঝোঁক বা ফরোয়ার্ড বায়াস প্রয়োগ

যখন জাংশনে এমনভাবে বহিঃস্থ ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় যাতে এটি বিভব প্রাচীর হ্রাস করে তড়িৎ প্রবাহ চালু করে তখন একে সম্মুখবর্তী ঝোঁক প্রয়োগ (forward biasing) বুঝায়। সম্মুখবর্তী ঝোঁক প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত p-টাইপের প্রান্তের সঙ্গে এবং ঋণাত্মক প্রান্ত n-টাইপ প্রান্তের সঙ্গে সংযোগ দেয়া হয়। চিত্র ১০.৯(ক) ও ১০.৯(খ)-এ সম্মুখবর্তী ঝোঁক প্রয়োগ এবং এর ফলে বিভব প্রাচীরের হ্রাস দেখানো হয়েছে। প্রযুক্ত সম্মুখবর্তী বিভব বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে যা বিভব প্রাচীরের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের বিপরীতে কাজ করে। সুতরাং লব্ধি ক্ষেত্র কমে যায় এবং প্রাচীরের উচ্চতা বা বিস্তার হ্রাস পায়। যেহেতু বিভব প্রাচীর ভোল্টেজের মান খুবই কম (0.1 থেকে 0.3 V), সুতরাং সামান্য সম্মুখবর্তী ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে বিভব প্রাচীরের প্রশস্ততা হ্রাস পায়। ফলে জাংশনে বাধা দূরীভূত হয় এবং তড়িৎ প্রবাহ শুরু হয়। সম্মুখ ঝোঁকে ব্যাটারীর ধনাত্মক প্রান্ত p-টাইপ বস্তুর সাথে যুক্ত হওয়ায় ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত ইলেকট্রনগুলোকে বামে অর্থাৎ p-টাইপ বস্তুর দিকে এবং ঋণাত্মক প্রান্ত n-টাইপের সাথে সংযুক্ত হওয়ায় ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্ত হোলগুলোকে ডানে অর্থাৎ n-টাইপ বস্তুর দিকে টানবে। ইলেকট্রন ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্ত দ্বারা বিকর্ষিত হয়ে p-টাইপের দিকে ধাবিত হয়। একইভাবে ধনাত্মক হোল (hole) ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত দ্বারা বিকর্ষিত হয়ে জাংশন অতিক্রম করে n-টাইপ বস্তুর দিকে ধাবিত হয়। জাংশনে ইলেকট্রন হোল পূর্ণ হয়। ইতোমধ্যে ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্ত n-টাইপ অর্ধ পরিবাহীতে ইলেকট্রনের নতুন সরবরাহ প্রদান করতে থাকে এবং ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত p-টাইপ অর্ধপরিবাহী হতে ইলেকট্রন টেনে নিয়ে নতুন হোল তৈরি করে। ফলে অবিরাম চার্জ তথা বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকে। এই প্রবাহের মান mA মানের হয়। এই তড়িৎ প্রবাহকে 'সম্মুখবর্তী তড়িৎ প্রবাহ' (Forward current) বলে।

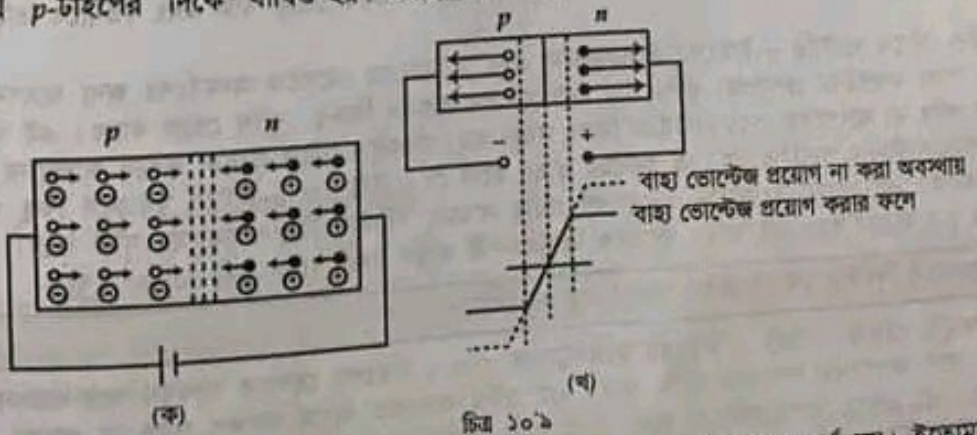

চিত্র ১০.৯

অনুসন্ধান I : সম্মুখ বায়াসের সময় নিঃশেষিত অঞ্চলে কী ঘটে?

যখন সংযোগটি সম্মুখ বায়াসে থাকে তখন আধান বাহকদের সংখ্যাগুরু অঞ্চল থেকে সংখ্যালঘু অঞ্চলে ব্যাপ্ত হয়—ইলেকট্রন হোলের দিকে ব্যাপিত হয়। সুতরাং হোল ও ইলেকট্রনগুলি নিঃশেষিত অঞ্চলের কাছাকাছি কোথাও মিলিত হয়। ফলে নিঃশেষিত অঞ্চল ক্ষীণ হতে থাকে ও নী-ভোল্টেজের (Knee voltage) বেশি ভোল্টেজের অঞ্চলে প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যায়।

সম্মুখবর্তী বায়াসের বৈশিষ্ট্য

১। জাংশন ডায়োডের অভ্যন্তরে উভয় প্রকার সংখ্যাগুরু বাহকের দ্বারা তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয়; কিন্তু বহিঃবর্তনীতে কেবলমাত্র ইলেকট্রন দ্বারা প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

২। সম্মুখবর্তী বায়াস প্রয়োগে সাধারণত কয়েক মিলি-অ্যাম্পিয়ারের তড়িৎ প্রবাহ পাওয়া যায়।

৩। প্রযুক্ত বিভব পার্থক্য বৃদ্ধি করলে প্রবাহমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

৪। প্রবাহমাত্রা এবং প্রযুক্ত বিভব পার্থক্যের লেখচিত্র অঙ্কন করলে সরলরেখা পাওয়া যায় না।

৫। সম্মুখবর্তী বায়াসে ডায়োডের নিঃশেষিত অঞ্চলের বেধ ক্রমশ হ্রাস পায়।

খ. বিপরীত ঝোঁক বা রিভার্স বায়াস প্রয়োগ

এক্ষেত্রে বাহ্য ভোল্টেজ এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যাতে বিভব প্রাচীরের উচ্চতা বা প্রশস্থতা বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের ঝোঁক প্রয়োগকে বিপরীত ঝোঁক প্রয়োগ (reverse biasing) বলে। বিপরীত ঝোঁক প্রয়োগের জন্য ব্যাটারির

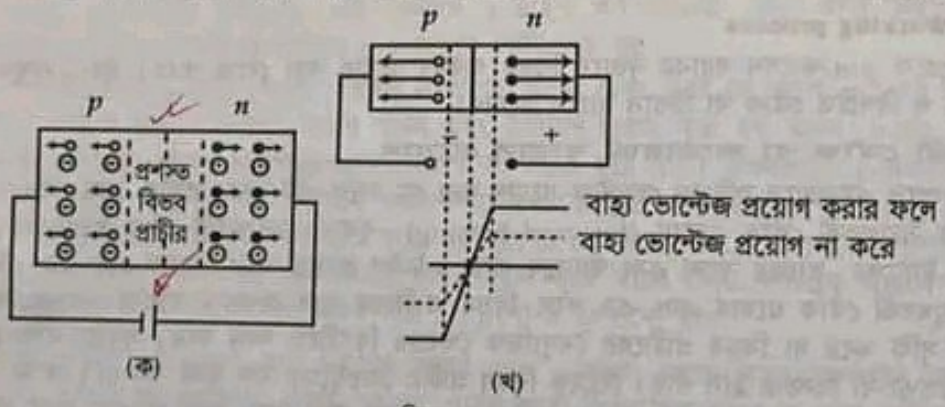

চিত্র ১০·১০

ঋণাত্মক প্রান্ত p-টাইপ প্রান্তের সঙ্গে এবং ধনাত্মক প্রান্ত n-টাইপ প্রান্তের সঙ্গে সংযোগ দেয়া হয়। প্রযুক্ত বিপরীত ভোল্টেজের জন্য সৃষ্ট বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বিভব প্রাচীরের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের দিকে কাজ করে। ফলে জাংশনে লব্ধি ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায় এবং বিভব প্রাচীরের উচ্চতা বেড়ে যায়। চিত্র ১০·১০-এ বিপরীত ঝোঁক প্রয়োগ ও বিভব প্রাচীর বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। বিভব প্রাচীর বৃদ্ধির ফলে বাহকের চলাচলে বাধা বা রোধ অনেক বেড়ে যায় এবং বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ হয় না।

বিপরীত ঝোঁকে ব্যাটারি n-টাইপের ইলেকট্রনকে এবং p-টাইপের হোলকে আকর্ষণের জন্য জাংশন থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। ফলে জাংশনের প্রশস্ততা বৃদ্ধি পায় এবং জাংশন বরাবর বিভব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না জাংশনের এবং ব্যাটারির বিভব সমান হয়। বিপরীত ঝোঁক প্রয়োগ করলে জাংশনের ভেতর দিয়ে খুব সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এ প্রবাহের কারণ হলো যে n-টাইপ ও p-টাইপে যথাক্রমে কিছু পরিমাণ হোল ও ইলেকট্রন থাকে। ওই সমস্ত ইলেকট্রন ও হোলের প্রবাহ সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে। এই প্রবাহের মান সাধারণত μA মানের হয়। এই তড়িৎ প্রবাহকে বিপরীতবর্তী তড়িৎ প্রবাহ (Reverse current) বলে।

কাজ : p–n জাংশনে বিপরীত ঝোঁকে প্রবাহ পাওয়া যায় না কেন ?

বিপরীতমুখী ঝোঁকে ব্যাটারি n-টাইপের ইলেকট্রনকে এবং p-টাইপের হোলকে আকর্ষণ করে জাংশন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ফলে জাংশনের প্রশস্ততা বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না জাংশন ও ব্যাটারির বিভব শূন্য হয়। এই প্রশস্ত বিভব প্রাচীরের জন্য বিপরীতমুখী ঝোঁকে কোনো প্রবাহ পাওয়া যায় না।

অনুসন্ধান II : বিপরীত বায়াসের সময় নিঃশেষিত অঞ্চলে কী ঘটে ?

যখন সংযোগটি বিপরীত বায়াসে থাকে তখন চার্জ বাহকদের ব্যাপন বন্ধ হয়। তাই নিঃশেষিত অঞ্চল প্রসারিত হয়। ইলেকট্রন ও হোলের চলাচলের মুখ্য প্রক্রিয়া প্রবাহ স্রোতও পরস্পর প্রায় বিলীন হয়।

বিপরীত বায়াসের বৈশিষ্ট্য

১। জাংশন ডায়োডের অভ্যন্তরে উভয় ধরনের সংখ্যাগুরু বাহকের দ্বারা তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয়; কিন্তু বহিঃবর্তনীতে কেবলমাত্র ইলেকট্রনের দ্বারা প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

২। বিপরীত বায়াসে সাধারণত কয়েক মাইক্রো-অ্যাম্পিয়ারের তড়িৎ প্রবাহ পাওয়া যায়।

৩। প্রযুক্ত বিভব পার্থক্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করলে প্রবাহমাত্রায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না।

৪। বিপরীত বায়াসে ডায়োডের নিঃশেষিত অঞ্চলের বেধ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে $p-n$ জাংশন একটি একমুখী যন্ত্র (device) যা একদিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। চিত্র ১০˙১১-এ একটি অর্ধপরিবাহী বা জাংশন ডায়োডের প্রতীক চিহ্ন দেখানো হয়েছে। ডায়োডের p-টাইপ অঞ্চলকে বলা হয় অ্যানোড এবং n-টাইপ অঞ্চলকে বলা হয় ক্যাথোড। চিত্রে তীরের সম্মুখ ঝোঁক প্রয়োগে তড়িৎ প্রবাহের দিক নির্দেশ করে।

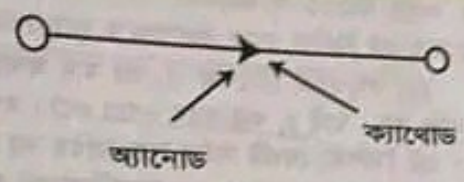

চিত্র ১০˙১১

১০˙৭ জাংশন ডায়োডের V—I বৈশিষ্ট্য লেখ
V—I characteristic curve of junction diode

চিত্র ১০˙১২

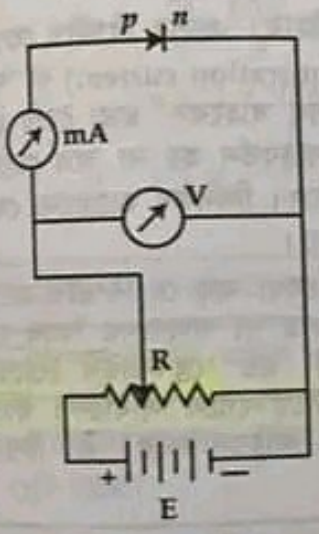

p-n জাংশনকে কোনো বর্তনীর অংশ হিসেবে ব্যবহারের জন্য এর সম্মুখবর্তী ও বিপরীত ঝোঁক বৈশিষ্ট্য জানা দরকার। অর্থাৎ সম্মুখবর্তী বা বিপরীত ভোল্টেজ পরিবর্তনের সঙ্গে এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহেরও পরিবর্তন ঘটে।

চিত্র ১০˙১২-এ একটি p-n জাংশন ডায়োড সম্মুখ ঝোঁকে দেখানো হয়েছে। বর্তনীতে অ্যামিটার A ডায়োড কারেন্ট এবং ভোল্টমিটার V ডায়োড ভোল্টেজ পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অ্যামিটারকে সব সময় বর্তনীতে শ্রেণি সংযোগ এবং ভোল্টমিটারকে সমান্তরাল সংযোগ দিতে হয়। ডায়োডে ভোল্টেজ পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তনশীল রোধ ব্যবহার করা হয়েছে। এখন সম্মুখবর্তী ভোল্টেজ শূন্য থেকে ধাপে ধাপে বাড়ানো হলে ভোল্টেজ বৃদ্ধির সাথে সাথে বর্তনীতে কারেন্টও বৃদ্ধি পায়। এবার ব্যাটারির সংযোগ উল্টো করে দিলে ডায়োডে বিপরীত ঝোঁক প্রযুক্ত হবে। সম্মুখ ঝোঁকের ন্যায় এক্ষেত্রেও ভোল্টেজ পরিবর্তন করলে কারেন্টেরও পরিবর্তন হবে। সম্মুখবর্তী ঝোঁক এবং বিপরীত ঝোঁকের জন্য ভোল্টেজ-কারেন্ট লেখচিত্র আঁকলে চিত্র ১০˙১৩-এর লেখচিত্র পাওয়া যাবে।

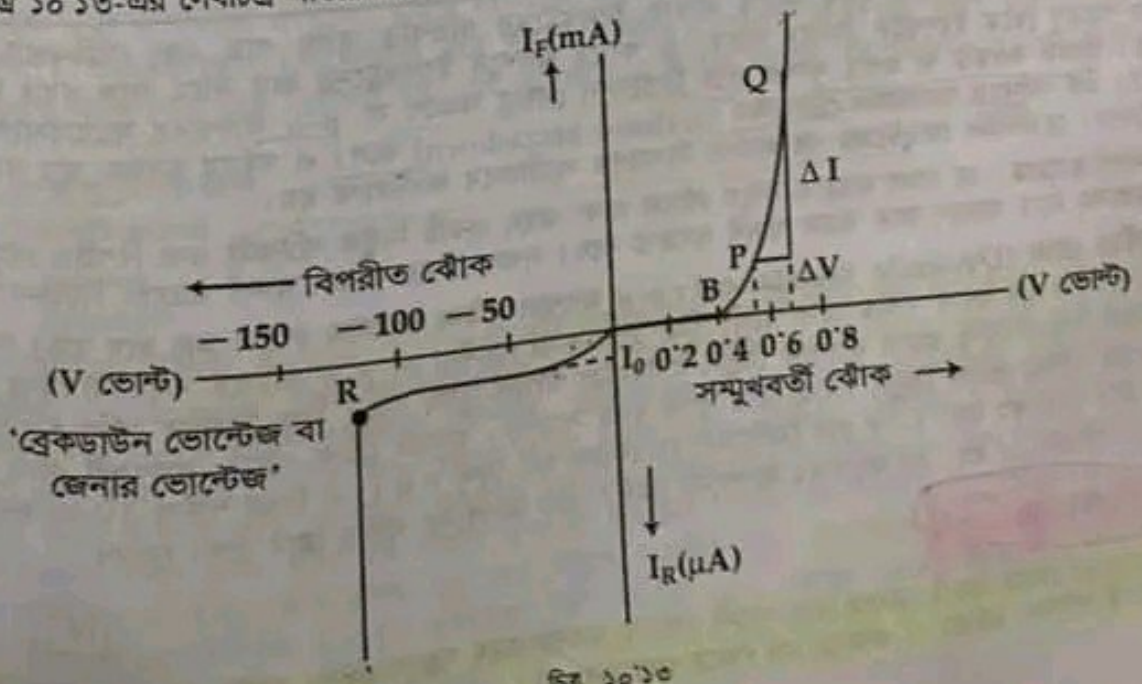

চিত্র ১০˙১৩

চিত্রে সম্মুখবর্তী V–I বৈশিষ্ট্য লেখ থেকে নিম্নলিখিত বিষয় লক্ষণীয়—

সম্মুখ ঝোঁকের ক্ষেত্রে :

(i) সম্মুখবর্তী ভোল্টেজ V_F বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কারেন্ট বৃদ্ধি পায় না। জার্মেনিয়াম ডায়োডের জন্য 0·3V এবং সিলিকন ডায়োডের জন্য 0·7V পর্যন্ত সম্মুখ কারেন্ট I_F শূন্য থাকে। 0·3V এবং 0·7V হলো যথাক্রমে জার্মেনিয়াম ও সিলিকনের অভ্যন্তরীণ বিভব প্রাচীর ভোল্টেজ V_0। বিভব প্রাচীর অতিক্রম করার জন্য চার্জ বাহকের ন্যূনতম V_0 ভোল্টেজের প্রয়োজন হয়। একে অপারেটিং ভোল্টেজ বলে। চিত্রে B অপারেটিং ভোল্টেজ। এর পর ভোল্টেজ আরও বৃদ্ধি করলে কারেন্ট সূচকীয়ভাবে বাড়ে এবং পরবর্তীতে কিছু সময়ের জন্য ভোল্টেজ কারেন্ট বৃদ্ধি সমানুপাতে হয়। ডায়োডের এই নির্দিষ্ট প্রযুক্ত ভোল্টেজকে সূচন ভোল্টেজ (Threshold voltage) বা কাট–ইন ভোল্টেজ বলে।

(ii) সম্মুখবর্তী ভোল্টেজ V_F এর মান অপারেটিং ভোল্টেজ V_0 অপেক্ষা বৃদ্ধি করা হলে অর্থাৎ $V_F > V_0$ হলে I_F দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাই I_F খাড়াভাবে ওপরে ওঠে। তখন এই V_F কে নী (Knee) ভোল্টেজ বলে। চিত্রে P বিন্দু ইহা নির্দেশ করে। এই বৈশিষ্ট্য লেখটি সর্বদা সরলরৈখিক নয়। অর্থাৎ V এবং I পরস্পরের সমানুপাতিক হয় না। সিলিকনের ক্ষেত্রে এই ভোল্টেজ এর মান 0·7 V এবং জার্মেনিয়ামের জন্য এই ভোল্টেজের মান 0·3 V।

(iii) B বিন্দু থেকে P বিন্দু পর্যন্ত প্রবাহ I_F এর মান ভোল্টেজ বৃদ্ধির সাথে সাথে সূচকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এজন্য BP অঞ্চলকে সূচকীয় অঞ্চল বলে।

বিপরীত ঝোঁকের ক্ষেত্রে :

(i) বিপরীত ঝোঁক V_R বৃদ্ধির সঙ্গে বিপরীত কারেন্ট I_R বৃদ্ধি পেয়ে I_0-তে পৌঁছায়। এরপর বিপরীত ভোল্টেজ বাড়ালেও কারেন্ট I_0 স্থির থাকে। I_0 কারেন্টকে 'বিপরীত সম্পৃক্ত কারেন্ট' (reverse saturation current) বা 'ক্ষরণ কারেন্ট' (leakage current) বলে। এই কারেন্ট *p*- এবং *n*-অঞ্চলে স্বল্পসংখ্যক 'সংখ্যালঘু বাহকের' দ্বারা তৈরি হয়। এর মান সাধারণত কয়েক μA। ভোল্টেজ পরিবর্তনের জন্য সংখ্যালঘু বাহকের সংখ্যা পরিবর্তন হয় না বলে ভোল্টেজ অনেক বাড়ালেও কারেন্ট স্থির থাকে। এই প্রবাহকে Reverse saturated current বলে। সিলিকন ডায়োডের ক্ষেত্রে এর মান 1 μA। শুধুমাত্র তাপমাত্রা পরিবর্তন হলে সংখ্যালঘু বাহকের সংখ্যার পরিবর্তন হয়।

(ii) বিপরীত বায়াস ভোল্টেজ বৃদ্ধি করে একটি ক্রান্তি (critical) মানে পৌঁছালে দেখা যায় যে বিপরীত কারেন্ট হঠাৎ করে অনেকগুণ বেড়ে যায়। এই সময় *p-n* জাংশনের রোধ সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যায় বা জাংশনের বিভব বাধা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে হয়। তাই এই বিশেষ ভোল্টেজকে বলা হয় 'ব্রেকডাউন ভোল্টেজ' (breakdown voltage)। চিত্রে R বিন্দু ইহা নির্দেশ করে। ব্রেকডাউন ভোল্টেজে পৌঁছে গেলে সাধারণত জাংশন ডায়োডের কার্যক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় ডায়োড পরিবাহীর ন্যায় আচরণ করে। এই ক্রিয়াকে জেনার ক্রিয়া বলে। বিজ্ঞানী মি. জেনার এই ক্রিয়া প্রথমে লক্ষ করেন।

সম্প্রসারিত কর্মকাণ্ড : *p–n* জাংশন ডায়োড রিভার্স বায়াসে ভোল্টেজ বৃদ্ধি করার সাথে সাথে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না। কিন্তু ক্রমাগত ভোল্টেজ বৃদ্ধি করা হলে দেখা যায় হঠাৎ করে এক পর্যায়ে প্রবাহের মান দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে ডায়াডে কী ঘটে—ব্যাখ্যা কর।

রিভার্স বায়াস ভোল্টেজ বৃদ্ধি করতে থাকলে ইলেকট্রনের গতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সেমিকন্ডাক্টর (*p–n*) ডায়োডের পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। এ পর্যায়ে জাংশনে ইলেকট্রনের ধ্বস নামে ফলে প্রবাহ দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রিভার্স কারেন্ট বা প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে ডিপলেশন লেয়ার অঞ্চলে বা *p–n* জাংশনের সংযোগস্থলে রোধের পতন ঘটে। এই পর্যায়কে অ্যাভালেন্স ব্রেকডাউন (avalence breakdown) বলে। এ পর্যায়ে ডায়োড তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। ব্রেকডাউন ভোল্টেজের পর জাংশন সাধারণত স্থায়ীভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আদর্শ ডায়োড : যে সকল ডায়োড সম্মুখ ঝোঁকে থাকা কালে একটি নিখুঁত পরিবাহী এবং বিপরীত ঝোঁকে থাকা কালে অন্তরকের ন্যায় আচরণ করে তাকে আদর্শ ডায়োড বলে। সকল ক্ষেত্রে আমরা আদর্শ ডায়োড বিবেচনা করি।

গতীয় রোধ (Dynamic resistance) : *p–n* জাংশনে বহিস্থ ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে তড়িৎ প্রবাহে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তাকে গতীয় রোধ বলে। চিত্র ১০.১৩-এ লক্ষণীয় যে *p–n* জাংশনে সম্মুখবর্তী ঝোঁক প্রয়োগে সামান্য বিভব পার্থক্য বৃদ্ধি করলে জাংশনে বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিপরীত ঝোঁক প্রয়োগে বিভব পার্থক্য অনেক বৃদ্ধির জন্যও বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রার বৃদ্ধি খুবই সামান্য। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, সম্মুখবর্তী ঝোঁক প্রয়োগে জাংশনের রোধ খুবই কম হয়। I—V লেখ বৈশিষ্ট্যের যে কোনো দুটি বিন্দু P ও Q-এ বিভব পার্থক্য ΔV-এর জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহের যে পরিবর্তন ΔI হয়, এর অনুপাতই জাংশনের রোধ। একে জাংশনের গতীয় রোধ বলে। সুতরাং

$$\text{গতীয় রোধ, } R = \frac{\Delta V}{\Delta I} \Omega \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad (10.1)$$

ডায়োডের ক্ষেত্রে বিমুখী রোধের মান সম্মুখী রোধের মানের চেয়ে বহুগুণ বেশি। যেমন Ge এর ক্ষেত্রে বিমুখী ও সম্মুখী রোধের অনুপাত 40000 : 1 এবং Si এর ক্ষেত্রে 1000000 : 1।

গাণিতিক উদাহরণ ১০.১

১। কোনো p–n জাংশনে $0{\cdot}2$ V বিভব পার্থক্য পরিবর্তনের জন্য 5 mA বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিবর্তন পাওয়া গেল। জাংশনের রোধ বের কর।

আমরা জানি,

জাংশনের রোধ, $R = \dfrac{\Delta V}{\Delta I}$

বা, $R = \dfrac{0{\cdot}2}{5 \times 10^{-3}}$

$= \dfrac{0{\cdot}2 \times 10^{3}}{5}$

$= \dfrac{200}{5} = 40\Omega$

এখানে,
$\Delta V = 0{\cdot}2$ V
$\Delta I = 5$ mA $= 5 \times 10^{-3}$ A
$R = ?$

২। একটি ট্রানজিস্টর রেডিও 9V ব্যাটারি দ্বারা 10 mW এ চলে। রেডিওর মধ্যে দিয়ে কী পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হয়? রেডিওর বৈদ্যুতিক রোধ কত?

[BUET Admission Test, 2018–19]

আমরা জানি,

$I = \dfrac{P}{V} = \dfrac{0{\cdot}01}{9}$ A

$= 1{\cdot}11 \times 10^{-3}$ A $= 1{\cdot}11$ mA

$R = \dfrac{V}{I} = \dfrac{9}{1{\cdot}11 \times 10^{-3}} = 8108\ \Omega$

এখানে,
$P = 10$ mW $= 0{\cdot}01$ W
$V = 9$ volt

কাজ : হোলের থেকে মুক্ত ইলেকট্রনের শক্তি বেশি থাকে কেন ?

হোলের মাধ্যমে তড়িৎ পরিবহন হতে হলে ইলেকট্রনকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হয়। এক্ষেত্রে ইলেকট্রনে সীমাবদ্ধ একটি পথ অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু মুক্ত ইলেকট্রনের মাধ্যমে তড়িৎ পরিবহনের সময় ইলেকট্রন নিজের খুশিমতো আঁকাবাঁকা পথে চলার সুযোগ পায়। ইলেকট্রনের গতির এ পথ সীমাবদ্ধ নয়। তাই ইলেকট্রনের শক্তি হোলের চেয়ে বেশি থাকে।

অনুধাবনমূলক কাজ : p–n জাংশনে ডিপ্লেশন লেয়ার চার্জ নিরপেক্ষ কেন ?

একটি p টাইপ ও একটি n টাইপ অর্ধপরিবাহীকে একত্রে যুক্ত করলে p–n জাংশন গঠিত হয়। p অঞ্চলে সংখ্যাগুরু বাহক হোল এবং n অঞ্চলে সংখ্যাগুরু বাহক ইলেকট্রন থাকে। যখন একত্রে সংযুক্ত করা হয় তখন n অঞ্চলের ইলেকট্রনগুলো p অঞ্চলের হোল দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় জাংশনের দিকে ছুটে যায়। সংযোগস্থলে হোল-ইলেকট্রন একত্রে মিশে গিয়ে চার্জ নিরপেক্ষ হয়। এই কারণে p–n জাংশন ডায়োড-এর ডিপ্লেশন লেয়ার চার্জ নিরপেক্ষ।

১০.৮ একমুখীকরণ
Rectification

১০.৮.১ ধারণা
Concept

যে পদ্ধতিতে পরিবর্তী প্রবাহকে (A. C.) একমুখী প্রবাহে (D. C.) পরিবর্তন করা হয় তাকে একমুখীকরণ বা রেকটিফিকেশন (rectification) বলে এবং যে বর্তনী এই কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় একমুখীকারক বা রেকটিফায়ার (rectifier)। জাংশন ডায়োডের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় আমরা জেনেছি যে ডায়োড একটা বিশেষ দিকে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। কিন্তু বিপরীত দিকে কোনো তড়িৎ প্রবাহ হয় না। জাংশন ডায়োডের এ বিশেষ ধর্মকে প্রবাহ একমুখীকরণ কাজে ব্যবহার করা হয়। AC প্রবাহের ধনাত্মক অর্ধচক্র যখন ডায়োডের ধনাত্মক প্রান্তের ভেতর দিয়ে যায় তখন ডায়োড সম্মুখ ঝোঁক প্রাপ্ত হয় আবার প্রবাহের ঋণাত্মক অর্ধচক্র যখন ডায়োডের ঋণাত্মক প্রান্তের ভেতর দিয়ে যায় তখন ডায়োড সম্মুখ ঝোঁক প্রাপ্ত হয় এবং বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। একমুখীকারক (rectifier) দুই ধরনের। যথা—(ক) অর্ধতরঙ্গ একমুখীকারক এবং (খ) পূর্ণতরঙ্গ একমুখীকারক। AC তরঙ্গ সময়ের সাথে সাথে দিক পরিবর্তন করে কিন্তু ডায়োডের ভেতর দিয়ে যাওয়ার পর একমুখী তরঙ্গ বা DC উৎপন্ন হয়। পূর্ণতরঙ্গ একমুখীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। নিম্নে ব্রীজ রেকটিফিকেশন আলোচনা করা হলো।

১০'১০ জাংশন ট্রানজিস্টর (পি-এন-পি ও এন-পি-এন)
Junction Transistor (*p-n-p* and *n-p-n*)

ট্রানজিস্টর হচ্ছে তিন প্রান্তবিশিষ্ট একটি অর্ধপরিবাহী ডিভাইস যার অন্তর্মুখী (Input) প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে বহির্মুখী (Output) প্রবাহ, বিভব পার্থক্য এবং ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। দুটি অর্ধপরিবাহী ডায়োডকে পাশাপাশি যুক্ত করে একটি অর্ধপরিবাহী ট্রায়োড বা ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়। 1948 সালে আমেরিকার বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরির তিনজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী বার্ডিন (Bardeen), ব্র্যাটেন (Brattain) এবং শকলে (Shockley) ট্রানজিস্টর আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের জন্য 1966 সালে তাদেরকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। আবিষ্কারের পর থেকেই ইলেকট্রনিক জগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে এই ট্রানজিস্টর। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে ট্রানজিস্টর।

১০'১০'১ গঠন
Construction

একখণ্ড বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী থেকে উচ্চতাপে বিশেষ নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়। সাধারণত পয়েন্ট কন্টাক্ট (Point contact) ট্রানজিস্টর ও জাংশন (Junction) ট্রানজিস্টর এই দুই ধরনের ট্রানজিস্টর তৈরি হয়।

তবে বর্তমানে ব্যবহৃত সমস্ত ট্রানজিস্টরই জাংশন ট্রানজিস্টর। ট্রানজিস্টর দুই ধরনের (ক) *n-p-n* ট্রানজিস্টর ও (খ) *p-n-p* ট্রানজিস্টর। ট্রানজিস্টরের ৩টি অংশ বা এলিমেন্ট (element) থাকে, যথা—এমিটার (emitter) বা নিঃসারক (E), বেস (base) বা পীঠ (B) এবং কালেক্টর (collector) বা সংগ্রাহক (C)। চিত্র ১০'১৯ (ক) ও (খ)-এ *n-p-n* ও *p-n-p* ট্রানজিস্টরের ব্লক (block) চিত্র এবং প্রতীক চিত্র দেখানো হলো।

দুটি পৃথক *n*-টাইপ কেলাসের মাঝখানে একটি *p*-টাইপ কেলাস বিশেষ পদ্ধতিতে পাশাপাশি রেখে যুক্ত করলে *n-p-n* ট্রানজিস্টর গঠন করা হয়। আবার দুটি পৃথক *p*-টাইপ কেলাসের মাঝখানে একটি *n*-টাইপ কেলাস যুক্ত করলে

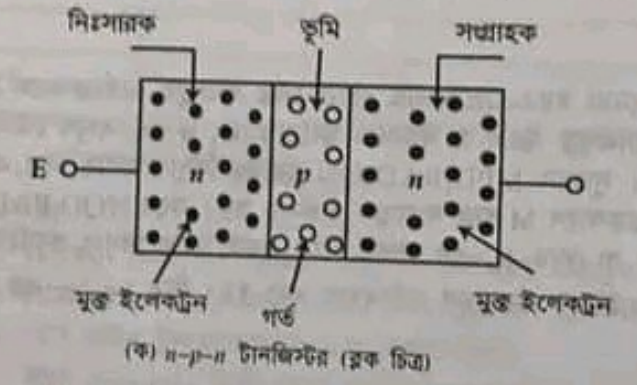

(ক) *n-p-n* ট্রানজিস্টর (ব্লক চিত্র)

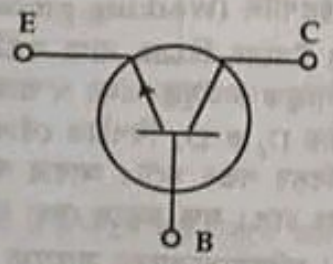

n-p-n ট্রানজিস্টরের প্রতীক চিত্র

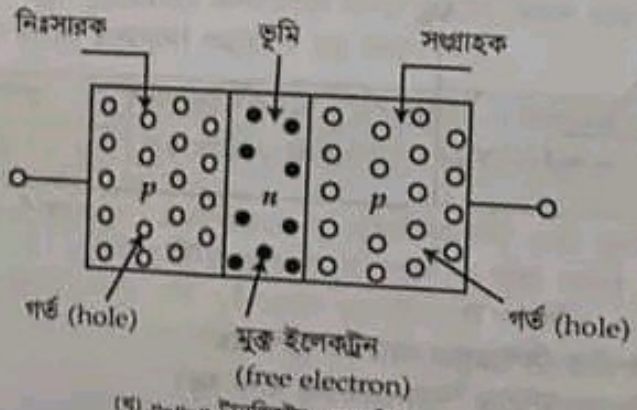

(খ) *p-n-p* ট্রানজিস্টর (ব্লক চিত্র)

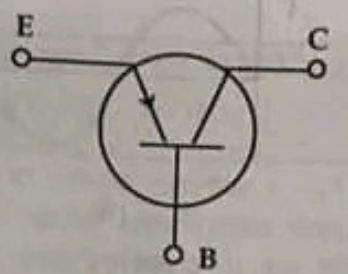

p-n-p ট্রানজিস্টরের প্রতীক চিত্র

চিত্র ১০'১৯

p-n-p ট্রানজিস্টর গঠন করা হয়। এই জোড়া লাগানো আঠা বা সোল্ডার করে করা হয় না। দুটি *p*-টাইপ অর্ধপরিবাহী এবং দুটি *n*-টাইপ অর্ধপরিবাহীর মাঝে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে যথাক্রমে *n*-টাইপ এবং *p*-টাইপ অর্ধপরিবাহী ডোপিং করে বা মিশিয়ে *n-p-n* বা *p-n-p* ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়। ট্রানজিস্টরের মাঝের বেস অংশ খুবই পাতলা এবং সামান্য পরিমাণে অপদ্রব্য মিশ্রণ করা হয়, যাতে এমিটার থেকে বাহক আধান (charge carrier) প্রবাহের সময় কম দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় এবং বিপরীত আধানের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিরপেক্ষ না হয়। এমিটার অংশ বেশ পুরু (thick) এবং বেশি পরিমাণে ডোপড (doped) বা ডোপায়িত করা হয়। কালেক্টর সবচেয়ে বেশি পুরু করা হয় যাতে উৎপন্ন তাপ তাড়াতাড়ি বিকিরিত হয়। ট্রানজিস্টরে দুটি জাংশন থাকে। যথা এমিটার-বেস জাংশন এবং অপরটি বেস-কালেক্টর জাংশন। পূর্বে বলা হয়েছে যে, দুটি *p-n* জাংশনের সমন্বয়ে একটি ট্রানজিস্টর গঠিত হয়। একটিকে সম্মুখ ঝোঁক বা বায়াস যুক্ত এবং

অপরটিকে বিপরীত ঝোঁক বা বায়াস যুক্ত করা হয়। সম্মুখ বায়াস যুক্ত জাংশনের রোধ বিপরীত বায়াস যুক্ত জাংশনের তুলনায় খুবই নগণ্য। দুর্বল সিগন্যাল (signal) বা সঙ্কেতকে কম রোধসমৃদ্ধ জাংশন বর্তনীতে প্রয়োগ করা হয় এবং উচ্চ রোধযুক্ত জাংশন বর্তনী থেকে আউটপুট নেয়া হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একটি ট্রানজিস্টর একটি সিগন্যালকে স্বল্প রোধ থেকে উচ্চ রোধে ট্রান্সফার (transfer) করে। এটি রেজিস্ট্যান্সের (resistance) বা রোধের মাধ্যমে কারেন্ট ট্রান্সফার করে বলে এর নামকরণ ট্রান্সফার রেজিস্টর (transfer resistor) সংক্ষেপে ট্রানজিস্টর (transistor) করা হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় **তিন প্রান্তবিশিষ্ট যে ক্ষুদ্র অর্ধ-পরিবাহক পদার্থে বহির্মুখী প্রবাহ, ভোল্টেজ এবং ক্ষমতা অন্তর্মুখী প্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে ট্রানজিস্টর বলে।** ট্রানজিস্টর আকারে অত্যন্ত ছোট হয় এবং ধাতব বা প্লাস্টিক আবরণের মধ্যে এটিকে সিল (seal) করে রাখা হয় যাতে বায়ু বা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে না আসে।

ট্রানজিস্টরের ঝোঁক ব্যবস্থা :

নিঃসারক (Emitter) : ট্রানজিস্টরের একপাশের অংশ যা চার্জ সরবরাহ করে তাই একে নিঃসারক বলে। বর্তনীতে পীঠ এবং নিঃসারক সর্বদা সম্মুখী ঝোঁক বা বায়াসে সংযোগ দেওয়া হয়। ফলে নিঃসারক বর্তনীর রোধ কম হয়।

সংগ্রাহক (Collector) : ট্রানজিস্টরের অন্যপাশের অংশ যা চার্জ সংগ্রহ করে তাই একে সংগ্রাহক বলে। বর্তনীতে সংগ্রাহক এবং পীঠ সর্বদা বিপরীত ঝোঁকে সংযোগ দেওয়া হয়। ফলে সংগ্রাহক বর্তনীতে রোধ বেশি হয়।

পীঠ বা ভূমি (Base) : ইহা নিঃসারক ও সংগ্রাহকের মাঝের অংশ বলে একে পীঠ বা ভূমি বলে। ট্রানজিস্টরের পীঠ নিঃসারকের তুলনায় খুবই পাতলা হয়।

জেনে রাখ : ট্রানজিস্টরের উপযোগিতা কী ? এর কোনো অসুবিধা আছে কী ? কি কি কাজে ইহা ব্যবহার করা হয় ?

ট্রানজিস্টরের উপযোগিতা হলো : (১) আকার খুব ছোট; (২) এটি খুব সামান্য বিভবে কাজ করে; (৩) এর ক্রিয়া তাৎক্ষণিক; (৪) এটি দীর্ঘস্থায়ী; (৫) এটি যান্ত্রিক কম্পন সহ্য করতে পারে এবং (৬) এটি খুব সস্তা।

ট্রানজিস্টরের অসুবিধা : (১) এটি উষ্ণতায় খুব সুগ্রাহী এবং (২) এটি খুব কম উৎপাদন শক্তি দেয়।

ব্যবহার : তড়িৎ সংকেত বিবর্ধন করতে, উচ্চ গতি সুইচ হিসেবে ট্রানজিস্টর ব্যবহৃত হয়।

অনুসন্ধান : উচ্চ কম্পাঙ্কযুক্ত এবং কম্পিউটার বর্তনীতে *n–p–n* ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয় কেন ?

বাহক হিসেবে হোলের তুলনায় ইলেকট্রনের দ্রুতি বেশি। *n–p–n* ট্রানজিস্টরে সংখ্যাগুরু বাহক হলো ইলেকট্রন, তাই উচ্চ কম্পাঙ্কযুক্ত এবং কম্পিউটার বর্তনীতে *n–p–n* ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়।

১০·১০·২ কার্যক্রম
Working process

***n–p–n* ট্রানজিস্টর :**

এখানে একটি *n–p–n* ট্রানজিস্টরের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করা হলো। চিত্র ১০·২০ (ক) ও (খ)-তে *n–p–n* ট্রানজিস্টরের বৈদ্যুতিক বর্তনী দেখানো হয়েছে। চিত্রে বামদিকের এমিটার বেস জাংশনকে সম্মুখ ঝোঁকে রাখা হয়েছে। ফলে *p* অঞ্চল *n*-অঞ্চলের তুলনায় বেশি ধনাত্মক হচ্ছে। এর ফলে *n* অঞ্চলের ইলেকট্রনগুলো সহজেই *p* অঞ্চলে চলে আসতে পারে। অর্থাৎ এমিটার থেকে ইলেকট্রনগুলো বেসে চলে আসে। ফলে ইমিটার বা নিঃসারক প্রবাহ I_E সৃষ্টি হয়। ইলেকট্রনগুলো *p*-টাইপ বেসে বা পীঠে প্রবেশ করার ফলে সেখানকার হোল-এর সাথে মিলতে চায়। কিন্তু বেস খুব পাতলা হওয়ার কারণে সামান্য কিছু ইলেকট্রন (5% প্রায়) হোল-এর সাথে মিলিত হয়ে খুব ক্ষুদ্র বেস প্রবাহ I_B সৃষ্টি করে।

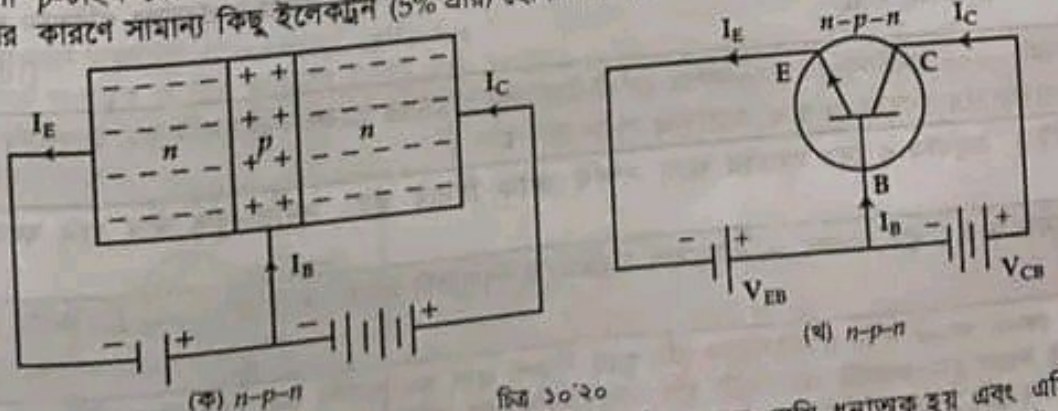

(ক) *n–p–n* (খ) *n–p–n*

চিত্র ১০·২০

ডানদিকের বেস কালেকটর জাংশনকে বিপরীত ঝোঁকে রাখায় কালেকটর অঞ্চল বেশি ধনাত্মক হয় এবং এমিটার থেকে বেসে প্রবাহিত ইলেকট্রনগুলোকে তীব্রভাবে *n*-অঞ্চলের দিকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ *n*-স্তর বা কালেকটর (সংগ্রাহক)

করা হয়। এক্ষেত্রে একটির বহির্গামী অপরটির অন্তর্গামী হিসেবে কাজ করে। মাইক, অ্যালার্ম, ইন্টারকম, রেডিও ইত্যাদি ক্ষেত্রে ট্রানজিস্টর অ্যাম্পিলিফায়ারকে ব্যবহার করা হয়।

ট্রানজিস্টর সিগন্যালকে দুই ভাবে বৃদ্ধি করতে পারে— (১) বেস কারেন্টের সাহায্যে কালেকটর কারেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং (২) আউটপুট রোধকে ইনপুটের রোধের তুলনায় অনেক বেশি মানের ব্যবহার করে।

ট্রানজিস্টরকে অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহারের সময় এমিটারকে সম্মুখ ঝোঁক বা বায়াসযুক্ত এবং কালেকটরকে বিপরীত ঝোঁক বা বায়াসযুক্ত রাখা হয়। ট্রানজিস্টরকে তিনটি প্রাথমিক বর্তনীর মাধ্যমে অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যথা—(১) কমন বেস (common base) বা সাধারণ পীঠ, (২) কমন এমিটার (common emitter) বা সাধারণ নিঃসারক এবং (৩) কমন কালেকটর (common collector) বা সাধারণ সংগ্রাহক অ্যামপ্লিফায়ার।

তিনটি বর্তনীর মধ্যে কমন এমিটার সার্কিটে ব্যবহৃত ট্রানজিস্টরের প্রবাহ বিবর্ধন এবং ক্ষমতা বিবর্ধন অনেক বেশি হওয়ায় এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। নিচের অনুচ্ছেদে আমরা একটি কমন এমিটার বিবর্ধকের কার্যপ্রণালি বর্ণনা করব।

১০·১২·১ কমন এমিটার বিবর্ধক
Common Emitter Amplifier

বর্তনী চিত্র ১০·২৯-এ একটি কমন এমিটার বিবর্ধকের বর্তনী সংযোগ দেখানো হয়েছে। চিত্র ১০·২৯ (ক) একটি *n-p-n* এবং ১০·২৯ (খ) একটি *p-n-p* বিবর্ধকের বর্তনী চিত্র। এখানে বেস ও এমিটারের মধ্যে একটি দুর্বল ইনপুট

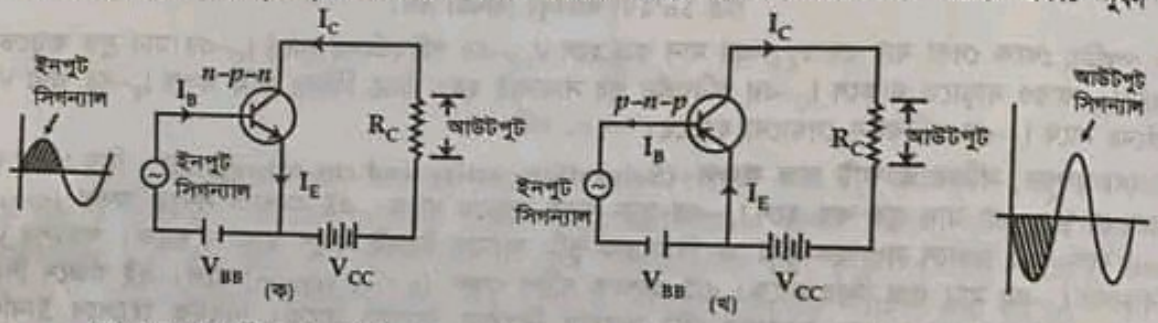

(ক) *n-p-n* অ্যামপ্লিফায়ার বর্তনী। (খ) *p-n-p* অ্যামপ্লিফায়ার বর্তনী।

চিত্র ১০·২৯

সিগন্যাল প্রয়োগ করা হয় এবং কালেক্টর ও এমিটারের মধ্য থেকে আউটপুট নেয়া হয়। কালেক্টর বর্তনীতে সংযুক্ত রোধ R_C থেকে বহির্গামী সংকেত গ্রহণ করা হয়। যেহেতু ইনপুট এবং আউটপুট উভয় ক্ষেত্রে এমিটার কমন (common), তাই এর নামকরণ কমন এমিটার বিবর্ধক।

ভালো বিবর্ধন পাওয়ার জন্য এসি সিগন্যাল ভোল্টেজ ছাড়াও এখানে একটি ব্যাটারি (V_{BB}) সার্কিটে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ডি. সি. ভোল্টেজকে বলা হয় বায়াস ভোল্টেজ; এবং এর মান এমন হয় যেন এসি সিগন্যালের ঋণাত্মক অর্ধেকের সময় এমিটার বেস জাংশন সম্মুখ ঝোঁকে থাকে। তা না হলে এমিটার বেস জাংশন বিপরীত ঝোঁক প্রাপ্ত হয় এবং আউটপুট বর্তনীতে কোনো প্রবাহ থাকবে না, ফলে অ্যামপ্লিফায়ার বিশ্বস্ততা হারাবে।

n–p–n ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ারের কার্যপ্রণালি
Working principle of *n–p–n* transistor amplifier

এমিটার বেস জাংশনে প্রযুক্ত সিগন্যালের ধনাত্মক অর্ধাংশের সময় জাংশনটির সম্মুখ ঝোঁক বৃদ্ধি পায়। ফলে অধিক পরিমাণ ইলেকট্রন এমিটার থেকে বেসের মধ্য দিয়ে কালেকটরে প্রবাহিত হয় এবং কালেকটর প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। এই বর্ধিত কালেকটর প্রবাহ (I_C) কালেকটরের ভার রোধ (load resistance) R_c-তে অধিক পরিমাণে বিভব পতন (voltage drop) ঘটায়। অর্থাৎ বহির্গামীতে অধিক ভোল্টেজ পাওয়া যায়।

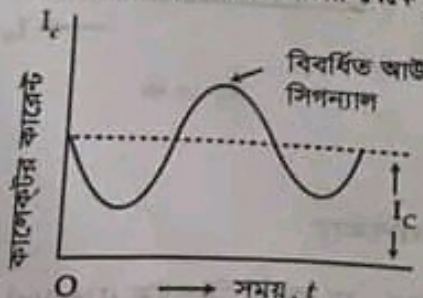

চিত্র ১০·৩০

সিগন্যালের ঋণাত্মক অর্ধাংশের জন্য এমিটার বেস জাংশনের সম্মুখ ঝোঁক কমে যায় ফলে কালেকটর প্রবাহের মাত্রাও কমে যায়। কালেকটর প্রবাহ কম হওয়ায় বর্তনীর আউটপুট ভোল্টেজ (output voltage) কম হয় তবে তা ইনপুট সিগন্যাল থেকে বেশি হয়। এভাবে ট্রানজিস্টর দুর্বল ইনপুট সিগন্যালকে বিবর্ধিত আউটপুট সিগন্যালে পরিণত করে। এই বিবর্ধিত আউটপুটের এবং ইনপুটের মধ্যে দশা পার্থক্য 180° হয়। চিত্র ১০·৩০-এ কালেক্টরের সম্পূর্ণ প্রবাহ সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন দেখানো হয়েছে।

কমন এমিটার বিবর্ধকের বিভিন্ন ধরনের বিবর্ধন
Different gains in common emitter amplifier

কমন এমিটার বিবর্ধকের বিভিন্ন ধরনের বিবর্ধন রয়েছে। এগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

(i) প্রবাহ বিবর্ধন গুণক (Current amplification factor) :

(ক) ডিসি প্রবাহ বিবর্ধন (dc current amplification, β_{dc}) : V_{CE} স্থির থাকলে, সংগ্রাহক প্রবাহ I_C ও ভূমি প্রবাহ I_B-এর অনুপাতকে DC প্রবাহ বিবর্ধন বলে। সুতরাং,

$$\beta_{dc} = \left(\frac{I_C}{I_B}\right)_{V_{CE}} \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad (10.4)$$

(খ) এসি প্রবাহ বিবর্ধন (ac current amplification, β_{ac}) : V_{CE} স্থির থাকলে সংগ্রাহক প্রবাহের পরিবর্তন (ΔI_C) ও ভূমি প্রবাহের পরিবর্তন (ΔI_B)-এর অনুপাতকে এসি প্রবাহ বিবর্ধন বলা হয়। সুতরাং,

$$\beta_{ac} = \left(\frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}\right)_{V_{CE}} \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad (10.5)$$

(ii) এসি ভোল্টেজ বিবর্ধন (ac voltage amplification, A_V) : আউটপুট ভোল্টেজের পরিবর্তন এবং ইনপুট ভোল্টেজের পরিবর্তনের অনুপাতকে এসি ভোল্টেজ বিবর্ধন বলা হয়। একে A_V দ্বারা সূচিত করা হয়। অতএব,

$$A_V = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta V_{in}} = \frac{\Delta I_C \times R_L}{\Delta I_B \times R_{in}}$$

$$= \left(\frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}\right)\left(\frac{R_L}{R_{in}}\right)$$

$$= \beta_{ac} \times \left(\frac{R_L}{R_{in}}\right) \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad (10.6)$$

এখানে R_L ও R_{in} যথাক্রমে আউটপুট ও ইনপুট রোধ।

(iii) এসি ক্ষমতা বিবর্ধন (ac power amplification, A_P) : আউটপুট ক্ষমতার পরিবর্তন ও ইনপুট ক্ষমতার পরিবর্তনের অনুপাতকে এসি ক্ষমতা বিবর্ধন বলা হয়। একে A_P দ্বারা সূচিত করা হয়। অতএব,

$$A_P = \frac{\Delta V_{CE} \times \Delta I_C}{\Delta V_{in} \times \Delta I_B} = \left(\frac{\Delta V_{CE}}{\Delta V_{in}}\right)\left(\frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}\right) \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad (10.7)$$

$$= A_V \times B_{ac}$$

আবার,

$$A_P = \frac{\Delta I_C^2 \times R_L}{\Delta I_B^2 \times R_{in}} = \left(\frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}\right)^2 \times \left(\frac{R_L}{R_{in}}\right) \quad \ldots \quad \ldots \quad [10.7(a)]$$

$$= \beta^2_{ac} \times \text{রোধের বিবর্ধন}$$

গাণিতিক উদাহরণ ১০.২

১। একটি কমন এমিটার ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ারের আউটপুট রোধ 550 kΩ এবং প্রবাহ বিবর্ধন 55। যদি অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট রোধ 250 Ω হয়, তবে অ্যামপ্লিফায়ারের ক্ষমতা বিবর্ধন কত?

আমরা জানি, ক্ষমতা বিবর্ধন,

$$A_P = \beta^2 \times \frac{R_{out}}{R_{in}}$$

$$\therefore A_P = (55)^2 \times \frac{550 \times 10^3}{250}$$

এখানে,

$R_{out} = 550\ k\Omega = 550 \times 10^3\ \Omega$

$\beta = 55$

$R_{in} = 250\ \Omega$

$A_P = ?$

এবং $P_i = (\Delta I_B)^2 \times R_i$

$$\therefore \quad P_A = \frac{(\Delta I_C)^2 \times R_L}{(\Delta I_B)^2 \times R_i} = \left(\frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}\right)^2 \times \frac{R_L}{R_i} = (\beta)^2 \times \frac{R_L}{R_i}$$

$$= \beta \times \beta \times \frac{R_L}{R_i}$$

∴ ক্ষমতা লাভ = প্রবাহ লাভ × ভোল্টেজ লাভ।

প্রবাহ বিবর্ধন গুণক
Current amplification factor

সাধারণ পীঠ বা কমন বেস বিবর্ধকের ক্ষেত্রে ইনপুট কারেন্ট হলো I_E এবং আউটপুট কারেন্ট I_C। I_E-এর সামান্য পরিবর্তনের জন্য I_C-এর যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রবাহ বিবর্ধন গুণক (α) বলে। সংগ্রাহক পীঠ ভোল্টেজ V_{CB} ধ্রুব থাকলে I_C ও I_E এর অনুপাতকে কারেন্ট বিবর্ধন গুণক বলে।

অর্থাৎ $$\alpha = \left(\frac{I_C}{I_E}\right)_{V_{CB}}$$

$$= \left(\frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}\right)_{V_{CB}} \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad (10.9)$$

α এবং β-এর মধ্যে সম্পর্ক

সমীকরণ (10.3) হতে পাই,

$$I_E = I_B + I_C$$

বা, $$\Delta I_E = \Delta I_B + \Delta I_C$$

বা, $$\Delta I_B = \Delta I_E - \Delta I_C \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad (10.10)$$

সমীকরণ (10.8) অনুসারে,

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

বা, $$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E - \Delta I_C} = \frac{\Delta I_C / \Delta I_E}{1 - \Delta I_C / \Delta I_E}$$

$$= \frac{\alpha}{1-\alpha} \quad [\because \alpha = \Delta I_C / \Delta I_E] \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad (10.11)$$

জানার বিষয় : সাধারণ ভূমি সংযোগে ব্যবহৃত ট্রানজিস্টরের চেয়ে সাধারণ নিঃসারক সংযোগে ব্যবহৃত ট্রানজিস্টরের প্রবাহ বিবর্ধন এবং ক্ষমতা বিবর্ধন অনেক বেশি হওয়ায় সাধারণ নিঃসারক সংযোগই বেশি গ্রহণযোগ্য।

কাজ : ট্রানজিস্টরের বেস অংশ পাতলা করে তৈরি করা হয় কেন ?

ট্রানজিস্টরের মাঝে থাকে বেস আর দুই পাশে থাকে ইমিটার ও কালেকটর। বেস অংশ হালকা করে তৈরি করা হয় যাতে ইমিটার থেকে আসা অধিকাংশ চার্জ বাহক এ অংশে ভেদ করে কালেকটর অংশে চলে যেতে পারে।

হিসাব : একটি কমন বেস সংযোগে কারেন্ট বিবর্ধন ফ্যাক্টর হলো 0·9 এবং এমিটার কারেন্ট 1 mA হলে বেস কারেন্ট কত?

এখানে, $\alpha = 0{\cdot}9$, $I_E = 1$ mA

$\alpha = \frac{I_C}{I_E}$ থেকে I_C নির্ণয় করতে হবে।

এরপর $I_E = I_B + I_C$ সমীকরণে $I_E = 1$ mA ও উপরের প্রাপ্ত I_C এর মান বসিয়ে I_B নির্ণয় করা হয়।

১০·২ ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ারের ব্যবহার

(১) ইন্টারকমে ব্যবহার করা হয়।
(২) অ্যালার্ম সার্কিটে ব্যবহার করা হয়।
(৩) রেডিওতে ব্যবহার করা হয়।
(৪) মাইকে ব্যবহার করা হয়।

১০.১২.৩ অন্তর্গামী ও বহির্গামী রোধ

ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ারের কর্মক্ষমতা মূলত নির্ভর করে অন্তর্গামী রোধ (R_i), বহির্গামী রোধ (R_0), ভার রোধ (R_L), প্রবাহ বিবর্ধন গুণাঙ্ক (α), প্রবাহ লাভ (β), ভোল্টেজ লাভ (V_A) এবং ক্ষমতা লাভ P_A এর ওপর।

অন্তর্গামী রোধ (Input resistance) : ধ্রুব কালেক্টর ইমিটারে ভোল্টেজে (V_{CE}) বেস-ইমিটার ভোল্টেজের সামান্য পরিবর্তন (ΔV_{BE}) এবং এর ফলে বেস প্রবাহের পরিবর্তনের (ΔI_B) অনুপাতকে অন্তর্গামী রোধ বা গতীয় রোধ (R_D) বলে। অর্থাৎ

অন্তর্গামী রোধ $R_i = \dfrac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B}$, অ্যামপ্লিফায়ারের রোধ ইমিটার-বেস ΔI_B সম্মুখী ঝোঁকে থাকার কারণে অন্তর্গামী রোধের মান খুব কম হয়।

বহির্গামী রোধ (Output resistance) : ধ্রুব বেস প্রবাহে কালেক্টর-ইমিটার ভোল্টেজের পরিবর্তন (ΔV_{CE}) এবং এর ফলে কালেক্টর প্রবাহের পরিবর্তনের (ΔI_C) অনুপাতকে বহির্গামী রোধ বলে। অর্থাৎ

বহির্গামী রোধ, $R_0 = \dfrac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C}$

অ্যামপ্লিফায়ারের কালেক্টর ইমিটার – কালেক্টর বিপরীত ঝোঁকে থাকার জন্য বহির্গামী রোধ উচ্চ মানের হয়।

গাণিতিক উদাহরণ ১০.৩

১। ট্রানজিস্টর-এর সাধারণ পীঠ সংযোগে রয়েছে। এর নিঃসারক প্রবাহ 0·85 mA এবং পীঠ প্রবাহ 0·05 mA। প্রবাহ বিবর্ধন গুণক α ও β-এর মান বের কর। [ঢা. বো. ২০১০, ২০০৫; সি. বো. ২০০৬; রা. বো. ২০০৪; কু. বো. ২০০২; RUET Admission Test. 2007-08]

আমরা জানি,

$I_E = I_C + I_B$

$I_C = I_E - I_B = (0{\cdot}85 - 0{\cdot}05)\ \text{mA}$

$= 0{\cdot}80\ \text{mA}$

এখানে,

$I_B = 0{\cdot}05\ \text{mA}$

$I_E = 0{\cdot}85\ \text{mA}$

এখন, $\alpha = \dfrac{I_C}{I_E} = \dfrac{0{\cdot}80}{0{\cdot}85} = 0{\cdot}94$

এবং $\beta = \dfrac{I_C}{I_B} = \dfrac{0{\cdot}80}{0{\cdot}05} = 16$

২। কোনো ট্রানজিস্টরের কমন বেস সার্কিটে এমিটার কারেন্ট 100 μA থেকে 150 μA-এ উন্নীত করায় কালেক্টর কারেন্ট 98 μA থেকে 147 μA-এ উন্নীত হলো। এক্ষেত্রে কারেন্ট এ্যামপ্লিফিকেশন ফ্যাক্টর নির্ণয় কর। [য. বো. ২০০৬]

আমরা জানি,

$\alpha = \dfrac{\Delta I_C}{\Delta I_E}$

$= \dfrac{49 \times 10^{-6}}{50 \times 10^{-6}} = 0{\cdot}98$

এখানে,

$\Delta I_E = 150\ \mu\text{A} - 100\ \mu\text{A} = 50\ \mu\text{A}$

$= 50 \times 10^{-6}\ \text{A}$

$\Delta I_C = 147\ \mu\text{A} - 98\ \mu\text{A} = 49\ \mu\text{A}$

$= 49 \times 10^{-6}\ \text{A}$

$\alpha = ?$

৩। একটি ট্রানজিস্টরের নিম্নলিখিত রাশিগুলি পরিমাপ করা হলো। $I_C = 5\ \text{mA}$, $I_B = 100\ \mu\text{A}$। ট্রানজিস্টারের α, β এবং I_E-এর মান বের কর। [রা. বো. ২০০৭]

আমরা জানি, $\beta = \dfrac{I_C}{I_B}$

সুতরাং, প্রশ্নানুসারে, $\beta = \dfrac{5 \times 10^{-3}\ \text{A}}{100 \times 10^{-6}\ \text{A}}$

$= \dfrac{5 \times 10^{-3}\ \text{A}}{0{\cdot}1 \times 10^{-3}\ \text{A}} = 50$

দেওয়া আছে,

$I_C = 5\ \text{mA} = 5 \times 10^{-3}\ \text{A}$

$I_B = 100\ \mu\text{A}$

$= 0{\cdot}1 \times 10^{-3}\ \text{A}$

সংখ্যা পদ্ধতির ভিত
Base of number system

কোনো সংখ্যা পদ্ধতির ভিত বা বেস হচ্ছে ওই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মৌলিক চিহ্নসমূহের মোট সংখ্যা। যেমন দশমিক পদ্ধতিতে দশটি মৌলিক চিহ্ন আছে; যথা— 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। সুতরাং এর ভিত্তি বা বেস 10। সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিতের উপর নির্ভর করে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। ডিজিটাল সার্কিটে চার ধরনের গাণিতিক সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। এগুলি হলো :

১। দশমিক বা 10 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি
২। বাইনারি বা 2 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি
৩। অক্টাল বা 8 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি
৪। হেক্সাডেসিমেল বা 16 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ইত্যাদি।

ইলেকট্রনিকস বর্তনীর শ্রেণিবিভাগ
Types of electronic circuits

ইলেকট্রনিকস বর্তনীকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(i) এনালগ ইলেকট্রনিক বর্তনী (Analogue electronic circuit) এবং (ii) ডিজিটাল ইলেকট্রনিক বর্তনী (Digital electronic circuit)

(i) এনালগ বর্তনী : এই ধরনের বর্তনীতে প্রবাহমাত্রা এবং ভোল্টেজ সংকেত (signal) সময়ের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়। এই সংকেতগুলোকে এনালগ বা নিরবচ্ছিন্ন (continuous) সংকেত বলে। চিত্র ১০·৩২-এ একটি এনালগ সংকেতের প্রকৃতি দেখানো হয়েছে। স্পষ্টতই এটি সময়ের সাথে সাইন তরঙ্গরূপে পরিবর্তিত দেখানো হয়েছে। এর সর্বোচ্চ মান 4V। ভোল্টমিটার, অ্যামিটার, মাল্টিমিটার, গ্যালভানোমিটার ইত্যাদি এনালগ বর্তনীর উদাহরণ।

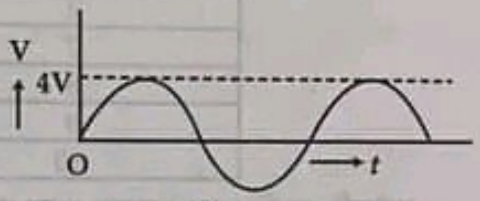

চিত্র ১০·৩২

(ii) ডিজিটাল বর্তনী : এই ধরনের বর্তনীতে প্রবাহমাত্রা এবং ভোল্টেজের সংকেতের মাত্র দুটি অবস্থা বা স্তর (level) থাকে; যথা— অন (ON) বা অফ (OFF) অথবা 0 বা 1। এই ধরনের সংকেতগুলোকে ডিজিটাল সংকেত বলে। অর্থাৎ ডিজিটাল পদ্ধতি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে আলাদা আলাদা একক বা ডিজিট (0, 1) ব্যবহৃত হয়। এই একক বা ইউনিটগুলো এককভাবে বা গুচ্ছাকারে ব্যবহার করে পূর্ণ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

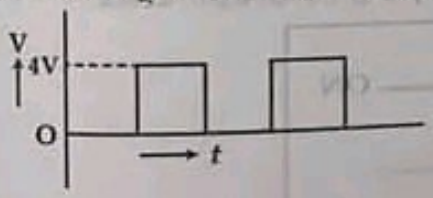

চিত্র ১০·৩৩

চিত্র ১০·৩৩-এ একটি ডিজিটাল সংকেত দেখানো হয়েছে। এই বর্তনীতে বাইনারি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। ডিজিটাল বর্তনীতে এক ভোল্টেজ স্তর থেকে অন্য ভোল্টেজ স্তরে যেতে সুইচ হিসেবে ডায়োড বা ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়। ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার ইত্যাদি ডিজিটাল বর্তনীর উদাহরণ। যোগাযোগ ব্যবস্থায় এনালগ ও ডিজিটাল উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

কাজ : ডিজিটাল ও এনালগ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কী ? ডিজিটাল ও এনালগ সিগনাল অঙ্কন করে দেখাও।

১। ডেসিমাল বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি (Decimal Number System) :

দশমিক পদ্ধতির ভিত্তি বা বেস হচ্ছে 10। কারণ এই পদ্ধতিতে মোট 10টি মৌলিক চিহ্ন আছে। যথা 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।

স্থানীয় মান : আমাদের প্রয়োজনীয় গাণিতিক কাজগুলো সাধারণত দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে করা হয়। দশমিক পদ্ধতির একটি সংখ্যা যেমন 528 ধরা যাক। এই সংখ্যাটির 5 অঙ্কটির নিজের মান 5, এই সংখ্যাটি তৃতীয় অবস্থানে (অর্থাৎ শতকের ঘরে) রয়েছে। এখানে সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত 10। সংখ্যাটিকে গাণিতিক ভাষায় লেখা যায়,

$$528 = 5 \times 100 + 2 \times 10 + 8 \times 1$$

বা, $5 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 8 \times 10^0$

উল্লেখ্য, শূন্য ছাড়া যে কোনো সংখ্যার ঘাত (Power) শূন্য হলে তার মান 1 হয়।

কোনো একটি দশমিক সংখ্যা প্রকাশের জন্য একক, দশক, শতকের ঘর অর্থাৎ 10^0, 10^1, 10^2 ইত্যাদির ঘর আছে। এখানে প্রত্যেকটি স্থানকেই 10 এর পাওয়ার (Power) হিসেবে দেখানো হয়েছে। যেমন 432·45-কে ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত উপায়ে লেখা যায়।

$$432{\cdot}45_{10} = 4 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 2 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$

২। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি (Binary Number System) :

বাইনারি পদ্ধতিতে 0 এবং 1 এই দুটি মাত্র অঙ্ক ব্যবহার করা হয়। এজন্য এই পদ্ধতিকে দ্বিমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। এ সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বা বেস 2। এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত 0 বা 1 অঙ্ককে বিট বলা হয়। সাধারণত ৪টি বিট সমন্বয়ে 1টি বাইট (byte) গঠিত হয়।

দশমিক পদ্ধতিতে 0 থেকে 9 পর্যন্ত গণনার জন্য একটি স্থান প্রয়োজন এবং তার পরে দ্বিতীয় বা অন্যান্য স্থান ব্যবহার করা হয়। যেমন 9 এর পরে 10 হয়। তেমনি বাইনারি পদ্ধতির 0 এবং 1 গণনার জন্য একটি স্থান, তারপর দ্বিতীয় বা অন্যান্য স্থান প্রয়োজন হয়। নিচের সারণিতে দশমিক ও সমকক্ষ বাইনারি নিয়মে গণনা দেখানো হয়েছে।

সারণি-১

দশমিক পদ্ধতি	বাইনারি পদ্ধতি
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010

বাইনারি পদ্ধতি হলো সরলতম গণনা পদ্ধতি। বাইনারি বা 2 ভিত্তিক পদ্ধতি কম্পিউটারের জন্য প্রযোজ্য। 0 এবং 1 কে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে সকল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় লেখা যায়। এই পদ্ধতির বিট দুটিকে সহজে ইলেকট্রনিক উপায়ে নির্দেশ করা সম্ভব। কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক যন্ত্র দুটি অবস্থা সহজেই অনুধাবন করতে পারে। একটি হলো লজিক লেভেল 0, একে OFF, LOW, FALSE কিংবা NO-ও বলা হয়। অন্যটি হলো লজিক লেভেল 1, একে ON, HIGH, TRUE কিংবা YES-ও বলা হয়।

নিচের চিত্রে ডিজিটাল সংকেত (digital signal) দ্বারা ON ও OFF বা 1 ও 0 কে দেখানো হয়েছে।

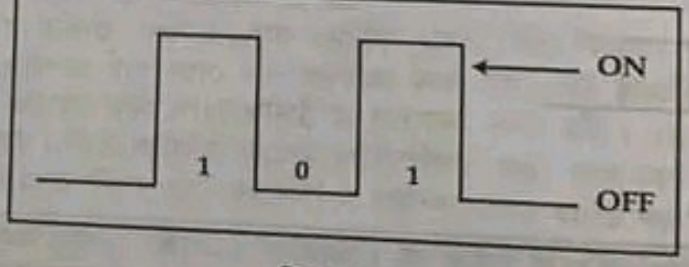

চিত্র ১০·৩৪

১০·১৪·১ বাইনারি নম্বর থেকে ডেসিমেল নম্বরে রূপান্তর
Conversion of binary number to decimal number

বাইনারি থেকে ডেসিমেলে রূপান্তর করতে প্রত্যেকটি ডিজিটের স্থানীয় মানকে 2 এর সূচক হিসেবে লিখতে হয়। কোনো ডিজিটের ডান পার্শ্বে যতটি ডিজিট থাকবে ডিজিটকে 2 এর তত সূচক দিয়ে গুণ করতে হবে। এভাবে প্রত্যেকটি ডিজিটকে 2 এর সূচক দিয়ে গুণ করে যোগ করে ডেসিমেলের মান পাওয়া যায় এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে 2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3} ইত্যাদি দিয়ে প্রথম থেকে পরপর ক্রমানয়ে গুণ করে গুণফলকে যোগ করে ডেসিমেলের মান পাওয়া যায়।

উদাহরণ I : বাইনারি 101011_2-কে ডেসিমেলে প্রকাশ কর।

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে,

$$101011_2 = 1\times2^5 + 0\times10^4 + 1\times2^3 + 0\times2^2 + 1\times2^1 + 1\times2^0$$
$$= 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 1 = 43$$

$\therefore \quad 101011_2 = 43_{10}$ (ডেসিমেলে প্রকাশিত)

উদাহরণ : বাইনারি সংখ্যা 1001 কে 110 দ্বারা ভাগ কর।

```
                  0110  ← result
divisor 110 ) 100100  ← dividend
                110
                ---
                110
                110
                ---
                000
                000
                ---
                  0
```

১০.১৬ লজিক গেট
Logic gate

লজিক গেট আলোচনার পূর্বে বুলিয়ান বীজগণিত (Boolean algebra) সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। George Boole (1815–1864) সর্বপ্রথম বুলিয়ান বীজগণিতের ধারণা দেন।

বুলিয়ান বীজগণিত (Boolean Algebra) : বুলিয়ান বীজগণিত মূলত লজিকের সত্য এবং মিথ্যা এই দুই স্তরের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। কম্পিউটারে যখন বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়, তখন বুলিয়ান বীজগণিতের সত্য এবং মিথ্যাকে 1 এবং 0 দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। কম্পিউটারের সমস্ত গাণিতিক ও যুক্তিমূলক সমস্যা বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সমাধান করা সম্ভব। বুলিয়ান বীজ-গণিতে শুধুমাত্র যোগ এবং গুণ-এর সাহায্যে সমস্ত কাজ করা হয়।

George Boole (1815-1864)

বুলিয়ান বীজগণিতের নিয়ম :

(i) যোগ চিহ্ন '+' দ্বারা OR বুঝানো হয়। $Y = A + B$, এটা পড়তে হয় Y, A অথবা B।

(ii) গুণ চিহ্ন (× বা ·) দ্বারা AND বোঝানো হয়। $Y = A . B$ পড়তে হয় Y, A এবং B এর মান সমান।

(iii) বার চিহ্ন (‾) দ্বারা NOT বোঝানো হয়, $Y = \bar{A}$, একে Y. NOT A হিসেবে পড়তে হয়। Y এর মান A এর মানের সমান।

বুলিয়ান বীজগণিতের তিনটি সূত্র (Three laws of Boolean algebra) :

১। বিনিময় সূত্র (Commutative law) : $A + B = B + A$
$AB = BA$

২। সংযোগ সূত্র (Associative law) :
$A + (B + C) = (A + B) + C$
$A . (B . C) = (A . B) . C$

৩। বন্টন সূত্র (Distributive law) :
$A . (B + C) = A . B + A . C$

বুলিয়ান বীজগণিতের কয়েকটি সম্পর্ক (Some relation of Boolean algebra) : নিচের সম্পর্কগুলোতে A হচ্ছে সংকেত। এর দুটি সম্ভাব্য মান রয়েছে; যথা 0 এবং 1। প্রতিটি সম্পর্কে একবার 0 এবং একবার 1 বসিয়ে সম্পর্কগুলো যাচাই করা যায়।

সম্পর্ক	সত্যতা যাচাই	
	যখন A = 0	যখন A = 1
1. $A + 0 = A$	$0 + 0 = 0$	$1 + 0 = 1$
2. $A + 1 = 1$	$0 + 1 = 1$	$1 + 1 = 1$
3. $A + A = A$	$0 + 0 = 0$	$1 + 1 = 1$
4. $A + \bar{A} = 1$	$0 + 1 = 1$	$1 + 0 = 1$
5. $A . 0 = 0$	$0 . 0 = 0$	$1 . 0 = 0$
6. $A . 1 = A$	$0 . 1 = 0$	$1 . 1 = 1$
7. $A . A = A$	$0 . 0 = 0$	$1 . 1 = 1$
8. $A . \bar{A} = 0$	$0 . 1 = 0$	$1 . 0 = 0$
9. $\bar{\bar{A}} = A$	$\bar{\bar{0}} = \bar{1} = 0$	$\bar{\bar{1}} = \bar{0} = 1$

লজিক গেট : বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করা হয়। লজিক গেট হলো এক ধরনের ইলেকট্রনিক বর্তনী যার দ্বারা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গঠন করা যায়। এ সকল ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সার্কিটকে লজিক গেট বলে। লজিক গেট বলতে সাধারণত লজিক সার্কিটকে বুঝায় যাতে এক বা একাধিক ইনপুট এবং কেবল একটি আউটপুট থাকে। লজিক গেটগুলো মূলত একটি ডিজিটাল পদ্ধতির জন্য মৌলিক ব্লক হিসেবে কাজ করে যা বাইনারি '0' (Zero) ও '1' (One) দ্বারা অপারেট হয়। তথ্য প্রবাহ (Flow of information) নিয়ন্ত্রণ করে বলেই একে গেট বলা হয়।

লজিক গেটের প্রকারভেদ : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে তিনটি মৌলিক লজিক গেট ব্যবহার করা হয়। এগুলো হলো (১) OR গেট, (২) AND গেট এবং (৩) NOT গেট। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে এই তিনটি মৌলিক গেট ছাড়া আরও কিছু গেট ব্যবহার করা হয়। যথা NAND গেট, NOR গেট, XOR গেট, XNOR গেট। এই গেটগুলো মৌলিক গেট দ্বারা তৈরি করা হয়।

সত্য সারণি বা ট্রুথ টেবিল (Truth table) : ইনপুট ও আউটপুট সিগনাল বা ভোল্টেজের বিভিন্ন মানের মধ্যে সম্পর্ক একটি টেবিলের সাহায্যে প্রকাশ করলে ওই টেবিলকে সত্য সারণি বা ট্রুথ টেবিল বলে।

লজিক গেটের ডি মরগানের তত্ত্ব : ফরাসি বিজ্ঞানী ডি মরগান (De Morgan) দুটি বিশেষ গাণিতিক উপপাদ্য আবিষ্কার করেন। সেগুলি তাঁর নাম অনুসারে ডি মরগান উপপাদ্য নামে পরিচিত।

De Morgan (1806-1881)

(ক) উপপাদ্য-১ : A ও B ইনপুট সিগনালের জন্য একটি NOR গেটের আউটপুট সিগনাল, $\bar{A}$ ও $\bar{B}$ ইনপুট সিগনালের জন্য একটি AND গেটের আউটপুট সিগনালের সমান হয়।

অর্থাৎ $\overline{A+B} = \bar{A}.\bar{B}$

(খ) উপপাদ্য-২ : A ও B ইনপুট সিগনালের জন্য একটি NAND গেটের আউটপুট সিগনাল, $\bar{A}$ ও $\bar{B}$ ইনপুট সিগনালের জন্য একটি OR গেটের আউটপুট সিগনালের সমান।

অর্থাৎ $\overline{A.B} = \bar{A} + \bar{B}$

জেনে রাখ : লজিক গেট কী ? বুলিয়ান বীজগণিতের মৌলিক কার্যক্রমগুলি কী কী ?

যে সকল ডিজিটাল (digital) ইলেকট্রনিক বর্তনী এক বা একাধিক ইনপুট গ্রহণ করে বুলিয়ান বীজগণিত অনুযায়ী প্রক্রিয়াজাত করে একটিমাত্র আউটপুট প্রদান করে তাকে লজিক গেট বলে। বুলিয়ান বীজগণিতের মৌলিক কার্যক্রমগুলি হলো (ক) লজিক যোগ বা OR যোগ (খ) লজিক গুণ বা AND গুণ (গ) লজিক সম্পূরক বা NOT কার্যক্রম।

❖ **NOT গেট** : NOT গেটে একটি ইনপুট এবং একটি আউটপুট থাকে। গেটের ইনপুট '1' হলে আউটপুট '0' এবং ইনপুট '0' হলে আউটপুট '1' হয়। একে ইনভার্টারও বলে। NOT গেটের বুলিয়ান সমীকরণ হলো,

$X = \bar{A}$

এখানে A এর উপর প্রদর্শিত বার দ্বারা NOT অপারেশন বুঝানো হয়। এই সমীকরণকে "X equals Not A" এভাবে পড়া হয় অথবা "X equals the complement of A" এভাবে পড়া হয়। নিচের চিত্র ১০.৩৫(ক)-এ NOT গেটের প্রতীক এবং ১০.৩৫(খ)-এ ট্রুথ টেবিল (সত্য সারণি) দেখানো হয়েছে।

চিত্র ১০.৩৫(ক) : NOT গেটের প্রতীক।

A	$X=\bar{A}$
0	0
1	0

চিত্র ১০.৩৫(খ) : NOT গেটের ট্রুথ টেবিল।

চিত্র ১০.৩৫(গ)-এ NOT গেটের একটি ইলেকট্রনিক বর্তনী দেখানো হয়েছে। বর্তনী থেকে প্রতীয়মান হয় যে সুইচ A বন্ধ থাকলে বাতিটি জ্বলবে না; কেননা বাতিটির দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য শূন্য হবে এবং কোনো তড়িৎ প্রবাহিত হবে না। সুইচ A খোলা থাকলে বাতিটি জ্বলবে।

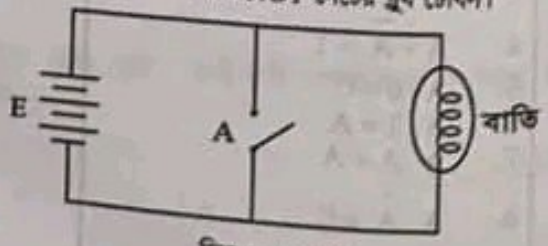

চিত্র ১০.৩৫(গ)

❖ **OR গেট :** OR গেট এমন এক ধরনের গেট যার দুই বা ততোধিক ইনপুট থাকে এবং একটিমাত্র আউটপুট থাকে।

ব্যাখ্যা : একটি OR গেট-এর দুটি ইনপুট যথাক্রমে A ও B হলে এবং আউটপুট X হলে OR গেট-এর বুলিয়ান সমীকরণ হবে,

$$X = A + B$$

এখানে + চিহ্ন দ্বারা সাধারণত যোগ বুঝানো হয় না। এই + চিহ্নের অর্থ OR অপারেশন।

নিম্নে একটি দুই ইনপুটবিশিষ্ট OR গেটের প্রতীক চিত্র ১০·৩৬(ক) এবং ট্রুথ টেবিল (Truth table) চিত্র ১০·৩৬(খ)-এ দেখানো হয়েছে।

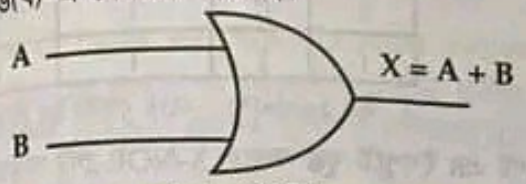

চিত্র ১০·৩৬(ক) : দুই ইনপুটবিশিষ্ট OR গেটের সংকেত।

A	B	X = A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

চিত্র ১০·৩৬(খ) : দুই ইনপুটবিশিষ্ট OR গেট-এর ট্রুথ টেবিল।

চিত্র ১০·৩৭ এ OR গেটের একটি ইলেকট্রনিক বর্তনী দেখানো হয়েছে। এই সমান্তরাল সুইচ বর্তনীর যেকোনো একটি সুইচ 'অন' করলে অথবা দুটি সুইচ একসঙ্গে অন করলে বাতিটি জ্বলবে।

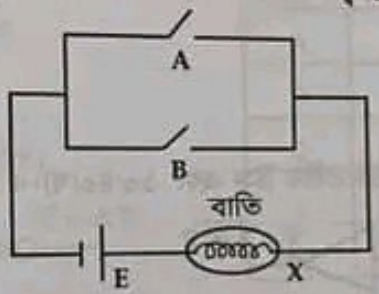

চিত্র ১০·৩৭

❖ **NOR গেট :** OR গেটের আউটপুট X'-কে NOT গেটের ইনপুটের সাথে সংযুক্ত করে NOR গেট তৈরি হয়। NOR গেটের দুই বা ততোধিক ইনপুট থাকতে পারে এবং একটিমাত্র আউটপুট থাকে। এখানে আউটপুট X-এর সমীকরণ হলো :

$$X = \text{NOT}(A + B) = \overline{A + B}$$

OR গেট ও NOT গেটের ট্রুথ টেবিলকে একত্রিত করে NOR গেটের ট্রুথ টেবিল পাওয়া যায়। চিত্র ১০·৩৮(ক)-এ বুলিয়ান সমীকরণসহ দুটি ইনপুটবিশিষ্ট NOR গেটে প্রতীক চিহ্ন এবং চিত্র ১০·৩৮(খ)-এ ট্রুথ টেবিল দেখানো হয়েছে।

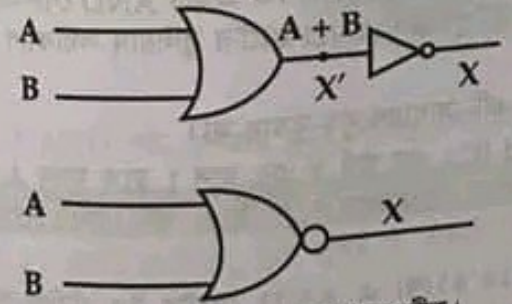

চিত্র ১০·৩৮(ক) : NOR গেটের প্রতীক।

A	B	A + B	$X = \overline{A + B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

চিত্র ১০·৩৮(খ) : NOR গেটের ট্রুথ টেবিল।

❖ **XOR গেট :** Exclusive-OR (XOR) গেট এমন এক ধরনের গেট যা এর ইনপুটে বিজোড় সংখ্যা আছে কিনা চিহ্নিত করে। XOR গেটের ইনপুটে বিজোড় সংখ্যক 1 হলে আউটপুট 1 হয়। দুটি বিটের অবস্থা তুলনা করার জন্য এই গেট ব্যবহার করা হয়। OR গেট, AND গেট এবং NOT গেট যুক্ত করে XOR গেট পাওয়া যায় চিত্র ১০·৩৯।

XOR গেটের বুলিয়ান সমীকরণ হলো—

$X = A \oplus B$, এখানে $\oplus$ দ্বারা XOR ক্রিয়া বোঝানো হয়েছে।

$= \bar{A}B + A\bar{B}$

চিত্র ১০·৩৯(ক)-এ XOR গেটের প্রতীক চিহ্ন এবং ১০·৩৯(খ)-এ ট্রুথ টেবিল দেখানো হয়েছে।

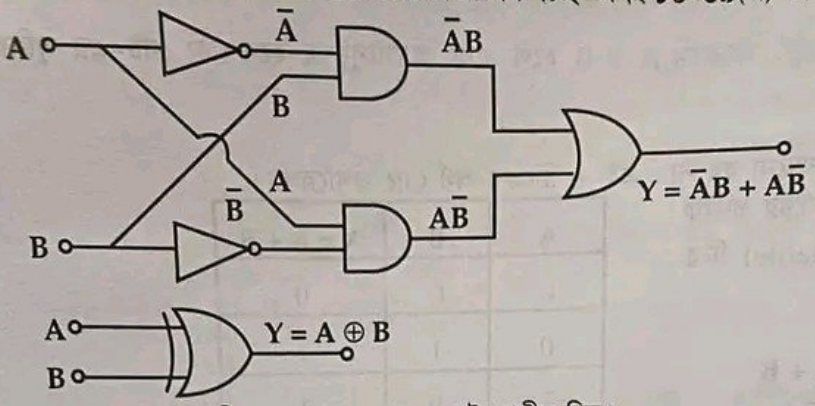

চিত্র ১০·৩৯(ক) : XOR গেটের প্রতীক চিহ্ন।

A	B	A + B	$X = A \oplus B$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

চিত্র ১০·৩৯(খ) : XOR গেটের ট্রুথ টেবিল।

❖ **X-NOR গেট :** XOR গেটের আউটপুটকে NOT গেট এর ইনপুটে যুক্ত করলে X-NOR গেট পাওয়া যায়। যে লজিক গেটের বিজোড় সংখ্যক ইনপুট হলে আউটপুট 0 হয় এবং জোড় সংখ্যক ইনপুট বা ইনপুট দুটি সমান হলে আউটপুট 1 হয় তাকে X-NOR গেট বলে।

X-NOR গেটের বুলিয়ান সমীকরণ হলো,

$$X = \overline{A \oplus B}$$

$$= \overline{\bar{A}B + A\bar{B}}$$

$$= AB + \overline{A}\,\overline{B}$$

চিত্র ১০·৪০(ক)-এ X-NOR গেটের প্রতীক চিহ্ন এবং ১০·৪০(খ)-এ ট্রুথ টেবিল দেখানো হয়েছে।

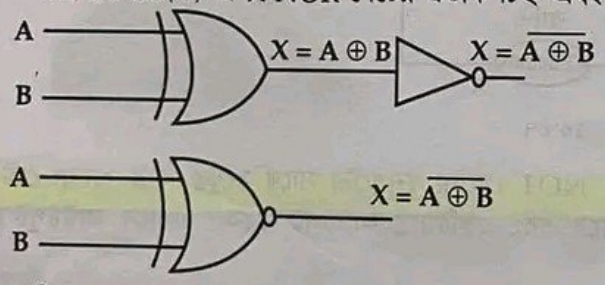

চিত্র ১০·৪০(ক) : X-NOR গেটের প্রতীক চিহ্ন।

A	B	$X = \overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

চিত্র ১০·৪০(খ) : X-NOR গেটের ট্রুথ টেবিল।

❖ **AND গেট :** AND গেটে দুই বা ততোধিক ইনপুট এবং একটি আউটপুট থাকে। AND গেটের সকল ইনপুট '1' হলেই কেবলমাত্র আউটপুট '1' হবে। অন্যথায় আউটপুট '0' হবে। অর্থাৎ **যে লজিক গেটের সবগুলো ইনপুট 1 হলে আউটপুট 1 হয় তাকে AND গেট বলে।** ১০·৪১ নং চিত্রে দুই ইনপুটবিশিষ্ট একটি AND গেট-এর প্রতীক এবং ট্রুথ টেবিল দেখানো হয়েছে। এর ইনপুট দুটি A এবং B এবং আউটপুট X। AND গেটের বুলিয়ান সমীকরণ হলো,

$X = A.B$

এই সমীকরণে '.' চিহ্নটি বুলিয়ান AND অপারেশন বুঝায়, এটি সাধারণ গুণ বুঝায় না।

$X = A.B$ সমীকরণটি পড়ার নিয়ম হলো "X equals A and B"। এর অর্থ X-এর মান 1 হবে যখন A এবং B উভয়ই 1 হবে। AND অপারেশনের জন্য বুলিয়ান সমীকরণ লেখতে সাধারণত '.' চিহ্ন বাদ দিয়ে লেখা হয়, $X = AB$.

চিত্র ১০·৪১(ক)-এ একটি AND গেটের প্রতীক এবং চিত্র ১০·৪১(খ) এ AND গেটের ট্রুথ টেবিল দেখানো হয়েছে।

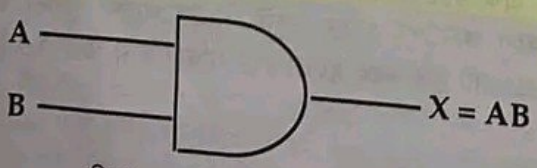

চিত্র ১০·৪১(ক) : AND গেটের প্রতীক।

A	B	X = AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

চিত্র ১০·৪১(খ) : AND গেটের ট্রুথ টেবিল।

১০·৪২ চিত্রে AND গেটের সমতুল্য একটি শ্রেণি সমবায়ে দুটি সুইচ সার্কিট দেখানো হয়েছে। এই সুইচ দুটির যেকোনো একটি অন করলে বাতিটি জ্বলবে না। কেবলমাত্র দুটি সুইচ অন করলেই বাতিটি জ্বলবে।

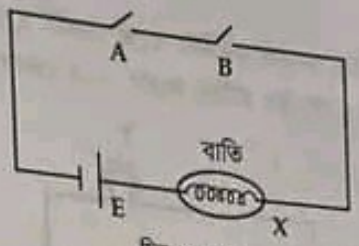

চিত্র ১০·৪২

❖ **NAND গেট :** AND গেটের আউটপুটে X' কে NOT গেটের ইনপুট এর সাথে যুক্ত করে NAND গেট তৈরি করা হয়। AND গেট হতে নির্গত সংকেতটি NOT গেটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে NAND গেটের কাজ হয়। বাস্তব সার্কিট তৈরির জন্য NAND গেটের বহুল প্রচলন রয়েছে।

চিত্র ১০·৪৩(ক)-এ NAND গেটের প্রতীক এবং ১০·৪৩(খ)-এ এর সমতুল্য সার্কিট দেখানো হয়েছে। দুই ইনপুটবিশিষ্ট NAND গেটের বুলিয়ান সমীকরণ হলো,

$$X = \overline{A.B}$$

AND এবং NOT গেটের ট্রুথ টেবিলকে একত্রিত করে NAND গেটের ট্রুথ টেবিল পাওয়া যায়। চিত্র ১০·৪৩(গ)-তে NAND গেটের ট্রুথ টেবিল দেখানো হয়েছে। ট্রুথ টেবিল থেকে দেখা যায় যে, AND গেটের আউটপুটকে ইনভারশন করলে যা হয় NAND গেটের আউটপুট তাই।

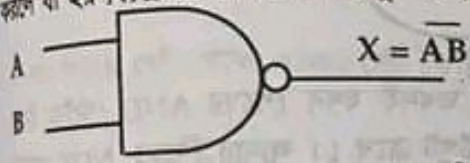

চিত্র ১০·৪৩(ক) : NAND গেটের প্রতীক।

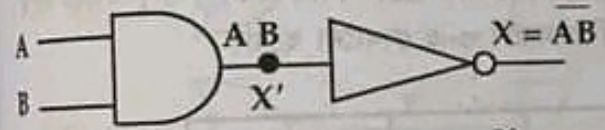

চিত্র ১০·৪৩(খ) : NAND গেটের সমতুল্য সার্কিট।

A	B	AB	$X = \overline{AB}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

চিত্র ১০·৪৩ (গ) : NAND গেটের ট্রুথ টেবিল।

NAND গেট এর ব্যবহার : Car interior লাইটিং ডিজাইনে ব্যবহৃত হয়। যখন দুটি দরজা বন্ধ করা হয় তখন লাইট এর সুইচ বন্ধ করার কাজে NAND গেট ব্যবহৃত হয় [চিত্র ১০·৪৪]।

চিত্র ১০·৪৪

NAND গেট ব্যবহার করে বিভিন্ন সংযোগের মাধ্যমে NOT গেট, AND গেট এবং OR গেট পাওয়া যায়।

বিভিন্ন প্রকার গেট তৈরিকরণ-এর সচিত্র উদাহরণ

১। একটি ব্যাটারি, দুটি সুইচ ও একটি বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করে একটি (i) OR ও একটি (ii) AND গেট তৈরি কর।

(ক) চিত্র ১-এর বর্তনীটি হলো একটা OR গেট বর্তনী। এখানে A অথবা B অথবা উভয় সুইচ অন করলে বাতিটি জ্বলবে। এর ট্রুথ টেবিল সারণি ১-এ দেখানো হয়েছে।

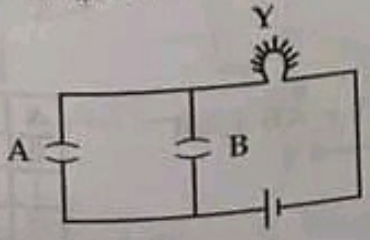

চিত্র ১

সারণি ১

A	B	Y
0	1	1
1	0	1
1	1	1

৬। শুধুমাত্র NAND গেট ব্যবহার করে XOR গেট তৈরি কর।

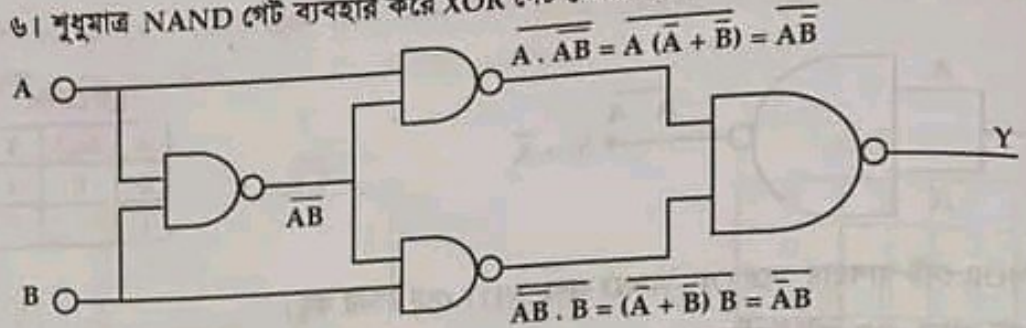

$\therefore Y = \overline{\overline{A\bar{B}}.\overline{\bar{A}B}} = \overline{\overline{A\bar{B}}} + \overline{\overline{\bar{A}B}} = A\bar{B} + \bar{A}B$, এটা XOR গেটের আউটপুট।

৭। চারটি NAND গেটের সমবায়ে গঠিত লজিক গেটের ট্রুথ টেবিল তৈরি কর।

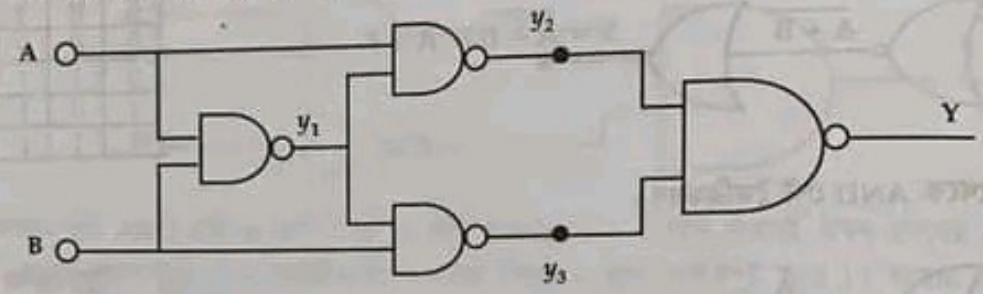

সংকেত : $y_1 = \overline{A.B}$, $y_2 = \overline{A.y_1}$, $y_3 = \overline{y_1.B}$, $Y = \overline{y_2.y_3}$

ট্রুথ টেবিল

A	B	$y_1 = \overline{A.B}$	$y_2 = \overline{A.y_1}$	$y_3 = \overline{y_1.B}$	$Y = \overline{y_2 + y_3}$
0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0

কাজ : NAND গেট এবং NOR গেটের সর্বজনীনতা বলতে কী বুঝ ?

OR, AND এবং NOT এই তিনটি মৌলিক গেটের সমন্বয়ে যেকোনো লজিক গেট তৈরি করা সম্ভব। তবে শুধু NAND গেট দিয়ে OR, AND এবং NOT গেট বাস্তবায়ন সম্ভব। অনুরূপভাবে NOR গেট দিয়েও যেকোনো লজিক সার্কিট বাস্তবায়ন সম্ভব। এজন্য NAND এবং NOR গেটকে সর্বজনীন গেট বলে।

গাণিতিক উদাহরণ ১০.৫

১। দেখাও যে, চিত্র ১০.৪৫(ক) ও (খ) বর্তনী দুটি পরস্পরের তুল্য বর্তনী।

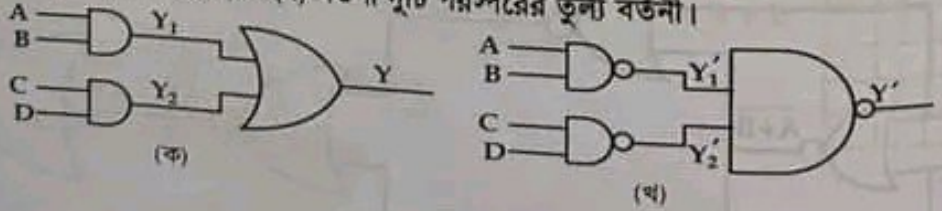

চিত্র ১০.৪৫

সমাধান : চিত্র ১০.৪৫(ক)-তে,

$Y_1 = AB$ এবং $Y_2 = CD$

সুতরাং, $Y = AB + CD$

... ... (i)

লজিক অবস্থা :

'0' = 0V

'1' = +5V

ট্রুথ টেবিল (Truth table)

ভোল্টেজ সংযোগ		ইনপুট		আউটপুট	ভোল্টেজ	অবস্থা
A	B	A	B	C	Output	LED condition
0V	0V	0	0	0	0V	OFF
0V	5V	0	1	1	5V	ON
5V	0V	1	0	1	5V	ON
5V	5V	1	1	1	5V	ON

কাজের ধারা (Working procedure)

১। 7432 আইসি চিত্র ১০'৪৯ এর ন্যায় ট্রেনার বোর্ড বসাতে হবে।

২। 1নং ও 2নং পিন A ও B এর সাথে এবং 7নং পিন এর সাথে ভূমি এবং 14নং পিন এর সাথে +5V সংযোগ দিতে হবে। 3নং পিন ট্রেইনার বোর্ডে LED বা ভোল্টমিটারের সাথে সংযোগ দিতে হবে।

৩। সুইচ OFF/ON করে আউটপুটের সত্যতা যাচাই করতে হবে।

৪। আইসি-তে চার সেট (A, B) ইনপুট এবং চারটি আউটপুট (C) আছে। যেকোনো সেটের জন্য OR গেটের অপারেশন LED বাতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

অনুরূপভাবে যথোপযুক্ত আইসি ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় বর্তনী সংযোগ দিয়ে NAND এবং NOR লজিক গেটের ট্রুথ টেবিল যাচাই করা যায়।

সতর্কতা :

১। সকল সংযোগ শক্তভাবে দিতে হবে।

২। 14নং পিন ট্রেনার বোর্ডে +5V এর সাথে যুক্ত করতে হবে।

৩। সুইচ ধীরে ধীরে অফ-অন করতে হবে।

কাজ : IC কী ? এর সুবিধা-অসুবিধাগুলি কী কী ?

ইনটিগ্রেটেড বা সমন্বিত সার্কিটের সংক্ষিপ্ত নাম IC। এটি হলো সেই বর্তনী যাতে বর্তনীর উপাংশ বা যন্ত্রাংশগুলো ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহক চিপে বিশেষ প্রক্রিয়ায় গঠন করা হয় যারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওই চিপের অংশ। IC-তে অনেকগুলো যন্ত্রাংশ যেমন রোধক, ধারক, ডায়োড, ট্রানজিস্টর ইত্যাদি এবং এদের অন্তঃসংযোগ একটি ক্ষুদ্র প্যাকেজ হিসেবে থাকে, যাতে এরা একটি পূর্ণ ইলেকট্রনিক কার্যাবলি সম্পন্ন করতে পারে। একটি ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহক পদার্থের মধ্যে এসব যন্ত্রাংশ গঠন ও সংযুক্ত করা হয়।

সুবিধা : (১) সংযোগ সংখ্যা কম কিন্তু নির্ভরযোগ্যতা বেশি। (২) অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি। (৩) ওজন কম (৪) কম বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। (৫) দাম কম।

অসুবিধা : কোনো যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে গেলে চিপটি পরিবর্তন করতে হয়। অংশবিশেষ মেরামত করা যায় না।

প্রয়োজনীয় গাণিতিক সূত্রাবলি

$I_E = I_B + I_C$ ... ... (1)

$\Delta I_E = \Delta I_B + \Delta I_C$ ... ... (2)

গতীয় রোধ, $R = \frac{\Delta V}{\Delta I}$ ... ... (3)

প্রবাহ বিবর্ধন গুণক, $\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}$ ... ... (4)

প্রবাহ লাভ, $\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$ ... ... (5)

প্রবাহ লাভ এবং প্রবাহ বিবর্ধন গুণক এর মধ্যে সম্পর্ক, $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$ ... ... (6)

ইলেকট্রনিক সুইচের ক্ষেত্রে বিভব পার্থক্য, $V_{out} = V_{CC} - I_C R_C$ ... ... (7)

পূর্ণ তরঙ্গ একমুখী কারেন্ট, $I_{dc} = \frac{2I_m}{\pi}$ ... ... (8)